প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

Gosto Behari Dutt & Sarat Chandra Paul.

Title Printer--GOSTO BEHARI DEY,
The Oriental Printing Works.
18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

শাখা—৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রীতি-উপহার
শ্রী রমা মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-বন্ধু

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের

কর-কমলে

এ বইখানি

উপহার দিলাম

৮২।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩০

সৌরীন্দ্র

"Margrete......my beloved husband

have I a place in your heart···?

Haakon. You have indeed ;···to bring

light and brightness into my life."

"Have you forgotten that it was through you that the best years of a young girl were embittered ?"

Ibsen.

"There's nothing in the world like the devotion of a married woman."

Oscar Wilde.

তৃতীয় সংস্করণ

প্রেয়সী

— ১ —

বৈশাখের প্রভাতে মৃদু রৌদ্র-হিল্লোলে কঙ্কণা নদীর স্বচ্ছ শান্ত বারিরাশি রূপালি পাতের মত ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। নদীটি খুব বড় নয়, তবে তাকে ছোটও বলা যায় না। নদীর দুই তীরে যত দূর দেখা যায়, কোথাও গাছপালার ঘন ঝোপ, কোথাও বা খোলা জমি। খোলা জমির উপর খুঁটীর মাচা, সেই মাচায় জেলেরা জাল মেলিয়া রাখিয়াছে। কয়েকখানা নৌকা উপুড় হইয়া ডাঙ্গার উপর পড়িয়া আছে, তলায় রঙ্ হইতেছে, আঠা মাখানো হইতেছে। এই সকালেই পার-ঘাটায় মৃদু কোলাহল সুরু হইয়াছে—লোক-জন পারে যাইবে। কেহ-বা নৌকা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, নদীতে মাছ ধরিতে যাইবে।

ইহারই একধারে ঘাটের কোলের কাছে প্রকাণ্ড একটা বাবলা ঝোপ। তাহারি নীচে একখানি পান্সী, সদ্য রঙ করা,—রাজহংসের মত জলে ভাসিতেছে। পান্সীতে লাল নিশান উড়িতেছে। পান্সীর উপর দুই-চারিজন লোক বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে। আটখানা

দাঁড়ে পান্সী সুসজ্জিত। দাঁড়ি-মাঝির গায়ে রঙ-করা জামা—দূর হইতে দেখিলে ভুল হয়, বুঝি-বা কলিকাতা হইতে কোনো ফুটবল-টীম ওপারে খেলিতে যাইবে বলিয়া পান্সীতে আসিয়া বসিয়াছে!

পান্সীখানি গ্রামের তরুণ জমিদার রজনীনাথ দত্তর। পান্সীর লাল নিশানে ইংরাজী হরফে নাম লেখা—R. Datta.

রজনীনাথ দত্ত জমিদারের ছেলে। কলেজে পড়িবার অছিলায় সেই যে সে কলিকাতায় গিয়াছিল, তারপর পাঁচ বৎসর আর দেশে ফেরে নাই! বুড়া বাপের বহু মিনতি তার কলিকাতার বাড়ীর দ্বারে আছড়াইয়া গিয়া পড়িয়াছে, তবু তার টনক নড়ে নাই! ইয়ার-দলের রঙীন পরামর্শে সমস্ত পৃথিবীটাকে সে এই প্রথম যৌবনে এমন সোনার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল যে বাকী জগৎটায় কালো কালি পড়িয়া সেটা একেবারে তার চোখের সামনে হইতে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, কাছাকাছি আর-এক গ্রামের জমিদারের মেয়ের সহিত। পাড়াগাঁয়ের জমিদার, তার না আছে মোটর, না জানে সে ভালো করিয়া দুইটা ইংরাজী কথা একত্র করিয়া কহিতে, মেয়েও তার তেমনি তৈরী হইয়াছিল।

বিবাহের পর রজনী যে-কয়দিন বাড়ী ছিল এবং বধূর সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়াছিল, সে কয়দিনে তার সঙ্গে ভাব যে একটুও হয় নাই, এমন নয়; তবে সে ভাবটা স্থায়ী প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দুই-জনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বধূ যে ইহাতে প্রাণে তেমন বেদনা পাইল, তাহা তার ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল না। বরং বন্দিত্ব

ঘুচিলে বাপের বাড়ী গিয়া সে মার কোল পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; পিসিমার কাছে রূপকথা শুনিয়া মাথার ঘোমটা ফেলিয়া হুটোপাটি করিয়া আরামে বর্ত্তাইয়া গেল। যেদিন কোন উৎসবের আহ্বানে প্রায় দু'শ ভরির সোনার গহনায় সে গা ঢাকিত, সেদিন বুঝিত, বিবাহ একটা লাভের বস্তু, তার উপর সে গহনাগুলো যখন এমন আয়ত্তের মধ্যে! স্বামীর বিরহে স্ত্রীর দুঃখ করিবার কোথাও যে কিছু আছে, এ চিন্তাও তার মনে উদয় হইত না।

রজনী কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল। এই বিপুল জন-তরঙ্গ, এই যে কেহ কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, কেহ কাহারো খাতির করে না, মেশের পাচক-ভৃত্য হইতে পথের কুলি অবধি ধমক খাইলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ওঠে—এ ব্যাপার তার কাছে এমনি বিসদৃশ ঠেকিল যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী ক্ষুদ্র জমিদারের ইহাতে থ হইয়া যাইবার কথাই বটে!

তারপর ধীরে ধীরে একটি-একটি করিয়া বন্ধু আসিয়া আসরে যখন দেখা দিতে সুরু করিল, তখন মন এই গল্প-কৌতুককে অবলম্বন করিয়া আবার আপনাকে প্রসারিত করিয়া মেলিবার প্রয়াস পাইল। ইয়ারেরা এই পল্লীর জীবটিকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল। রজনীর খরচে তাহাদের নিত্যকার চা ও জল-খাবার চলিত; তার উপর থিয়েটারে, বায়োস্কোপে রজনীর টাকায় আমোদ-উপভোগ প্রভৃতি সবগুলাই যদি নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে, তবে দুইদণ্ড ফুরসৎ পাইলে সঙ্গ দিয়া খোস্-গল্পে তাহাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতে আর কি এমন অসুবিধা! এই ইয়ার-দলে রজনীনাথ শীঘ্রই রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, আর ইয়ারেরাও পাত্রমিত্র সাজিয়া আসর জমকাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না।

এমনি খোলগল্প আর আমোদ-বিলাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িলে যেমন হয়, রজনীরও তাই ঘটিল। কলেজে যে ঠাঁইটুকুতে সে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছিল, সেইখানেই সে আস্তানা মৌরুসি-রকম রহিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর মন্দির-পথে গতি মন্থর হইল। সঙ্গীর দল টপাটপ ওদিকে টপ্‌কাইয়া গেলেও সন্ধ্যায় ও প্রভাতে মিলন-সভা তেমনি জম্‌জমাট থাকিত। সেখানে উঁচু-নীচুর মর্য্যাদা-বোধ আসিয়া সরল সঙ্গ-সাহচর্য্যে এতটুকু ঘা দেয় নাই, এতটুকু অস্পৃশ্যতার ব্যবধান টানিতে পারে নাই!

এমনি করিয়া সহরের চালচলন ও আদব-কায়দায় রজনী নিজেকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। থিয়েটারের ষ্টল হইতে বক্স এবং বক্স হইতে ক্রমে গ্রীণরুমে সে প্রোমোশন পাইয়াছিল; এবং সেই গ্রীণরুমে পদার্পণ হইবামাত্র দুই-একজন করিয়া অভিনেত্রীর কৃপাদৃষ্টি-লাভেও সে বঞ্চিত রহিল না। টাকা তো চিঠি লিখিবামাত্র আসিয়া পড়ে। সুতরাং ওদিক্‌কার সুখস্বর্গে প্রবেশের টিকিট কিনিতে যেটা প্রধান অবলম্বন, সে পয়সার অভাব কোনদিনই ঘটে নাই। প্রবাসে ছেলের পাছে কোন কষ্ট কি অস্বাচ্ছন্দ্য হয়, বৃদ্ধ পিতা সেদিকে যেমন প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তার কল্যাণের দিকে তেমনি তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই কল্যাণের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে রজনীনাথ এমন সবেগে গড়াইয়া চলিল যে তাহাকে আটকায় এমন সাধ্য কোন মহাবীরের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। সহরের সৌখীন সম্প্রদায় অত্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে ঘোড়-দৌড়ের ছুটন্ত ঘোড়ার ন্যায় রজনীর গতির বেগ নিরীক্ষণ করিত।

বিলাসে আমোদে যখন সে খুব পোক্ত হইয়া কলিকাতায় দুই-চারিটা বিশিষ্ট সমাজে দস্তুরমত নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে, কীর্ত্তি অর্জ্জন

করিয়াছে, তখন বুড়া বাপ তার সুখের পথে কাঁটা দিয়া একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। রজনী একটু কাঁপরে পড়িল; কিন্তু সবন্ধুর পরামর্শের অভাব ঘটিল না। তাহারা বুঝাইল, এই টাকাকড়ি ও জমিদারী প্রভৃতির বন্দোবস্ত যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ করিয়া কলিকাতায় কায়েমী ভাবে বাড়ী কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দাও। মিউনিসিপালিটির কমিশনারী হইতে সুরু করিয়া কৌন্সিলে যাওনের অধিকার পর্য্যন্ত টাকার জোরে তার হাতে চাঁদের মত পাড়িয়া আনিয়া দিবে, এ আশ্বাসও বন্ধুরা দিতে ছাড়িল না। রজনী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং টাকাকড়ির ব্যবস্থা পাকা করিয়া কলিকাতায় বাস করিবার বন্দোবস্ত কায়েমী করিবার উদ্দেশ্যে অচিরে গৃহযাত্রা করিল। দুই চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহাকে সঙ্গ দিয়া কৃতার্থ করিতে ছাড়িল না।

দেখিতে দেখিতে জমিদার-বাড়ী তাস-পাশা খেলার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গান-বাজনার বিচিত্র ঝঙ্কারে বাড়ীর ভিদ্ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হইতে যে বাড়ীখানা শোকের আঁধার বুকে পুরিয়া অহর্নিশি গুমরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সে বাড়ী গীতে বাদ্যে প্রমোদ-হাস্যে ঝঙ্কৃত হইয়া রঙ্গিণীর মত মাতিয়া উঠিল। শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণে হঠাৎ এক নিমেষে যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলতার বাণ ডাকিয়া গেল। একান্ত কুণ্ঠিত পল্লী-গৃহ সহসা এই বিলাসিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময় যে-পরিমাণে আকর্ষণ করিল, তেমনি ভবিষ্যতে এক মহা-দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় গ্রামের লোক শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কলিকাতা হইতে মোটর আসিল। বাগান-বাড়ীর সংস্কার হইয়া সে

এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রী ধারণ করিল। গ্রামের অদূরে নদী ছিল, পিয়ালী নদী। সেই নদীর জলে জমিদার বাবুদের মামুলি একখানা বজরা বাঁধা থাকিত,—জমিদারী-পরিদর্শনে কেহ কখনও বাহির হইলে এই বজরায় করিয়াই বাহির হইতেন। রজনীনাথ বজরার উপর একখানা পান্সী যোগ করিয়া দিল; তাহাতে আপাততঃ প্রত্যহ বেড়াইবার ধূমে নদী-বক্ষও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্থাৎ নূতন কর্ত্তা জলে-স্থলে চারিদিকে আপনার অমোঘ আধিপত্যের বিজয়-নিশান এমন সমারোহে উড়াইয়া দিল যে গ্রামের নিরীহ লোকগুলা তন্দ্রাভঙ্গে জলে স্থলে চারিদিকে প্রাণোন্মাদনার এক জীবন্ত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিল।

কয়েকদিন পরে বাবুদের মাছ ধরার বাতিক চাগিল। চার ছিপ সূতা বঁড়শী লইয়া বাবুরা একটা পুকুরকেও ছাড়িয়া দিল না। শেষে সখ মিটিলে বাতিক চাগিল, শীকারে যাইব। কোট ও খাকি-সর্ট পরিয়া রজনীনাথ বন্দুক লইয়া এ বন ও বন চষিয়া ফেলিল; সঙ্গে থাকিত কলিকাতার পারিষদবর্গ। প্রত্যেক ব্যাপারে পল্লী হইতেও সঙ্গী-সহচর মিলিয়াছিল বিস্তর।

গ্রামের কিছু দূরে একটা বিল ছিল। সঙ্গীরা পরামর্শ দিল, সেখানে পাখী মিলিবে। দেশের সঙ্গীর দল আগের রাত্রি হইতে সেখানে গিয়া আস্তানা পাতিল। বাবুরা মোটর হাঁকাইয়া সকালেই রওনা হইবেন কথা রহিল।

ভোর বেলায় পারিষদবর্গ-সমেত বাবু মোটর হাঁকাইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিল। অজনা গ্রামের শেষে মোটরের পথ নাই,—পায়ে হাঁটিয়া পাড়ি জমাইতে হইবে। কুছ্ পরোয়া নাই—বাবুরা তখন গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিল।

দুইধারে আম-কাঁঠালের বাগান। ছায়া-করা পথ। মাঝে মাঝে কুঁড়ে-ঘর, পুকুর, ভাঙ্গা কোঠা। দেখিতে নিপুণ পটুয়ার হাতে আঁকা ছবির মতই! সবুজ, হরিৎ, ধূসর রঙের পোঁচ-লাগানো! প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া তাহারা একটা বাগানের পথ ধরিয়া যাত্রা সংক্ষেপ করিয়া লইল।

বাগানের এক কোণে ছোট একটি পুকুর; পুকুরের পাড়ে একটা পুরানো জীর্ণ কোঠা-বাড়ী। অগ্রবর্ত্তী একজন পারিষদ হঠাৎ একটা জামরুল গাছের পিছনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন হইতে রজনীনাথ কহিল,—কি হে, থেমে গেলে যে!

অঙ্গুলি উঠাইয়া সঙ্গী সঙ্কেত করিল, চুপ।

সকলে অবাক হইল। আরো কাছে আসিলে সে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঘাটের দিকে দেখাইল। ঘাটে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী স্নান করিতেছিল। কতকগুলা তালগাছের গুঁড়ি ফেলিয়া ঘাটের ধাপ তৈয়ার হইয়াছে। শেষ গুঁড়িটার ধারে কতকগুলি মাজা বাসন। ঘাটের উপর একধারে রাশীকৃত পাঁশ গাদা হইয়া রহিয়াছে, অন্য ধারে কচুর জঙ্গল ও ঝোপ-ঝাপের মধ্য দিয়া পায়ে-চলা সরু পথ। পাড়ে সেই জীর্ণ বাড়ী, কতকালের প্রাচীন যখের মত দাঁড়াইয়া। বাড়ীর দেওয়াল বহিয়া নানা লতাপাতা উঠিয়াছে। বাড়ীর মধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে।

রজনীনাথ তরুণীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—এ দেব-কন্যা, না, অপ্সরা?

একজন সঙ্গী বলিল,—জঙ্গলের মধ্যে বনদেবী!

আর-একজন বলিল,—এ ফুল রাজোদ্যানেই শোভা পাওয়া উচিত।

রজনীনাথ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গী বলিল,—হায়রে, হতভাগ্য রাজোদ্যান!

বলিয়া সে রজনীনাথের পানে চাহিল। রজনী নির্ণিমেষ নেত্রে তরুণীকে দেখিতেছিল। তরুণী কিছুই জানিল না। কালো জলে সোনার অঙ্গ মেলিয়া নির্জ্জনে জলের কোলে সে যেন রূপের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল! কালো জল তার রূপের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া উল্লাসে রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল!

তরুণী স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিল, তীরে দাঁড়াইয়া ঘনকৃষ্ণ কেশের রাশি খুলিয়া দিয়া আর্দ্র কেশ মুছিল, তারপর কাপড়ের জল নিঙড়াইয়া বাসনের গোছা তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

রজনীনাথ তখন বাড়ীটার পানে সতৃষ্ণ নিরাশ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বাগানের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

বাগানের পর বাগান,—রাশি রাশি আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা-একটা ফলের গাছ—আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, জামরুল। বাগান পার হইয়া সরু পথ; খানা ডোবা ঝোপের ধার দিয়া সেই পথ ধরিয়া নদীর কিনারায় আসিয়া সকলে পৌঁছিল। স্থির নদীবক্ষে বে-পান্সী ভাসিতেছিল, সকলে সেই পান্সীতে উঠিল। আট দাঁড়ে পান্সী ছাড়িল।

— ২ —

তরুণীর নাম লক্ষ্মী। ওপারে পলাশডাঙ্গা গ্রাম; সেখানে একটা মাইনর স্কুল আছে। লক্ষ্মীর স্বামী রঘুনাথ সেই স্কুলে মাষ্টারী করে। এককালে তার অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ী ছিল বর্দ্ধমানের ওদিকে। দামোদর সেবারে ফুলিয়া ফাঁপিয়া তার বাড়ী ও ক্ষেত-খামার

সব গ্রাস করিয়াছে। রঘুনাথ কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া যায়। তারপর দুঃখে-কষ্টে কয়মাস এখানে-ওখানে ঘুরিয়া খপর পাইয়া এই চাকরির পিছনে সে ছুটিয়া আসে। অজ-পাড়াগাঁয়ের স্কুল,—মাষ্টারী করিতে লোক জোটে না। কাজেই রঘুনাথকে এখানে চাকরি জুটাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পলাশডাঙ্গায় বাসের যোগ্য তেমন ঘর নাই। যা আছে, সেখানে ছোটলোকের ভিড়। এখানে নির্জ্জন প্রান্তরে এই ভগ্ন কুটীরখানি তাই সে সংগ্রহ করিয়াছিল। ভাড়া দিতে হইত না। বাড়ীর মালিক এক বৃদ্ধা, দূর সম্পর্কে তার পিশি। তাহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ ছিল না। রঘুনাথ তাহাকে খাইতে দেয় এবং এই পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে সে এখানে পরম সুখেই বাস করিতে ছিল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর পরিচর্য্যায় বৃদ্ধা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল,—এবং সে এমনও আশা দিত যে তাহার ধূলা-গুড়া যা আছে, সব সে রঘুনাথের স্ত্রী লক্ষ্মীকেই দিয়া যাইবে। তার আর এ ত্রিভুবনে কে বা আছে!

ছেলেপিলের মধ্যে রঘুনাথের একটি কন্যা—মণি। মণির বয়স পাঁচ বৎসর। দেখিতে ঠিক ফুলের কুঁড়ির মত। এই দারিদ্র্য আর অবহেলার মধ্যে থাকিলেও মেয়েটি এমন যে তার পানে একবার চোখ পড়িলে সে চোখ আর সহজে ফিরিতে চাহিত না।

তার মা লক্ষ্মী রূপে যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি। রঘুনাথ প্রায়ই বলিত,—এ রূপ রাজার ঘরেই মানায়, লক্ষ্মী। আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার ভাঙ্গা কুঁড়েয় জীবন কাটালে তুমি, এই কি ভগবানের বিচার!

লক্ষ্মী তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিত,—থাক্, থাক্, এই কুঁড়েই আমার রাজার প্রাসাদ গো।

নিশ্বাস ফেলিয়া রঘুনাথ বলিত,—একগাছা কাঁচের চুড়িও তোমায় দিতে পারি না, লক্ষ্মী…

স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া লক্ষ্মী বলিত,—যাও, কি যে বল! এই নোয়া আমার হীরে-মাণিকের চেয়েও ঢের বেশী দামী। এর দাম তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি কি বুঝবে!

এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন লইয়া লক্ষ্মী খুবই সন্তুষ্ট ছিল। একটি দিনের জন্যও তার মনে এতটুকু অতৃপ্তি উঁকি দেয় নাই! তার কারণ, যে সম্পদ সে লাভ করিয়াছিল, তার কাছে রাজার ঐশ্বর্য্যও সে অতি তুচ্ছ মনে করিত। সে সম্পদ, স্বামীর প্রাণ-ঢালা ভালবাসা।

রঘুনাথ আপনাকে অকপটে লক্ষ্মীর কাছে ধরিয়া দিয়াছিল। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে সে লক্ষ্মীর পরামর্শ চাহিত। স্কুলে কোন্ ছেলে কবে কি দুষ্টামি করিল, কোন্ ছেলেটি বেশ ভালো পড়াশুনা করিতেছে, সে খপর পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর অজানা থাকিত না। এই নির্জ্জন অরণ্য-প্রদেশের একটি কোণে বসিয়া আশ-পাশের প্রত্যেক লোকটির কথা সে ভালোই জানিত। স্কুলের অনেক ছেলেই যেন তার কাছে বহুকালের চেনা। ক্যাবলা—সে ঐ নারাণ চক্রবর্ত্তীর ছেলে। ছেলেটি তোৎলা বলিয়া ক্লাশের ছেলেরা তাহাকে খ্যাপায়। গণেশ ছেলেটি ভারী ভালো; পড়াশুনায় সে সকলের উপরে। এমনি করিয়া প্রত্যেক ছেলেটি তাহার কত চেনা, যেন কত কালের জানা! অথচ সে কোনদিন তাহাদের চক্ষেও দেখে নাই।

একদিন রঘুনাথ বলিল,—ছেলেদের নিয়ে একটা দল খুলেছি। তারা এমনি তোয়ের হচ্ছে যে কারো ঘরে আগুন লেগেছে শুনলে তখনি প্রাণের মায়া ছেড়ে আগুন নিবুতে ছুটবে,—তা সে রাত

বারোটাই হোক্, আর বেলা পাঁচটাই হোক্! তারা সাঁতারে এমন দড় যে কেউ জলে ডুবেছে দেখলে তখনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটবে। দলের নাম রেখেছি, তরুণ-সঙ্ঘ।

লক্ষ্মী বলিল,—বাঃ, বেশ তো! আর কি করবে তারা? জলে ডোবা আর আগুন লাগায় বিপত্তি, এ তো নিত্যি ঘটচে না... নিত্যিকার জন্তে কি কাজ শেখাচ্ছ?

রঘুনাথ বলিল,—তারা প্রতি-রবিবার গাঁয়ের সবার দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করে চাল-ডাল-পয়সা নিয়ে আসে। যারা অনাথ আতুর খেতে পায় না, তাদের সেই চাল-ডাল হপ্তায় হপ্তায় ভাগ করে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মী বলিল,—আর যাদের অসুখ-বিসুখ হয়, তাদের দেখাশোনার, কি, ভার নেবার···?

রঘুনাথ একটু চিন্তিতভাবে কহিল,—সেইটেই ভাবনার কথা। সে তো পয়সা না হলে হয় না! ওষুধ-পথ্যি জোগাড় করা, সে তো খালি গতর দিয়ে হয় না লক্ষ্মী···

লক্ষ্মী বলিল,—সত্যি, তাদের কষ্ট আগে দূর করা উচিত। রোগে ভুগে বিনা-চিকিৎসায় কত লোক যে মারা যাচ্ছে, আহা!

রঘুনাথ বলিল,—ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়ে সে অভাবও ঘোচাবেন! একটু আশা দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—কেমন করে?

রঘুনাথ বলিল,—কলকাতায় থাকে একটি ছেলে, তার নাম যতীশ। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে এবার। তার মামার বাড়ী পলাশ-ডাঙ্গায়। তাদের অবস্থা খুব ভালো। এক বিধবা মা আছেন,—তা ছেলেটি

কখনো পাড়াগাঁ দেখেনি…সে এসেছে যার সঙ্গে এবার এই ছুটিতে পাড়াগাঁ দেখতে। মাতামহর বেশ পয়সা-কড়ি আছে, অথচ ঐ ছেলেরই সব; মাতামহী ছাড়া তার এখানে কেউ নেইও। সেই ছেলেটি আমাদের তরুণ-সঙ্ঘ দেখে তাতে যোগ দিয়েছে। ক'দিনে সে চমৎকার সাঁতার শিখেছে। সে বলেছে, তার মাকে বলে একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স আর কতকগুলো ওষুধের বই কিনে দেবে। হোমিওপ্যাথির বই-গুলো পড়ে আমিই একটু-আধটু শিখব। তারপর ছেলেদের কিছু কিছু শিখিয়ে দেব। তাতে ছোট-খাটো ব্যারামের চিকিৎসা এক রকম চলে যাবে'খন।

লক্ষ্মী বলিল,—দেখ, তোমার সঙ্ঘর ছেলেদের একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে হয় না?

রঘুনাথ সাগ্রহে বলিল,—খাওয়াবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী বলিল,—তুমি যদি বল—

—বেশ তো…একটা সুবিধেও হয়েছে। তারা একদিন কোথাও বন-ভোজন করবে বলছিল। তাদের বরং বলি, এই বাগানে এসে চড়িভাতি কর। জন পনেরো ছেলে,—যারা বড়, তাদের নিয়েই চড়িভাতি হবে। তুমি গোছগাছ করে তাদের সব বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

লক্ষ্মী সহর্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

রঘুনাথ বলিল,—তুমি আমার লক্ষ্মী!

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—আমি তো লক্ষ্মীই—আর তোমারই লক্ষ্মী, এ আর নতুন কথা কি গো!

— ৩ —

শীকারে গিয়া রজনীনাথের মন শীকারে ঠিক বসিতেছিল না। সেই যে পুকুরের কালো জলে রক্ত-কমলটি ফুটিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহারি বর্ণে-গন্ধে মন তার একেবারে দিশাহারা হইয়া উঠিল। ওপারে পাল্কী রাখিয়া রজনী সদলে একটা মাঠে গিয়া উঠিল—মাঠ ভাঙ্গিয়া বাঁধ পার হইয়া জলা। জলার ধারে ধারে চকাচকি, ছোট-ছোট স্নাইপ গাংচিল—এমনি কয়েকটা পাখী মিলিল। তারপর সূর্য্য যখন আকাশের মাঝামাঝি দীপ্ত তেজে তার সাত ঘোড়ার রথ চালাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রথের চাকাগুলা দিয়া যেন আগুন ঝরিতে লাগিল! সান্-হ্যাট্ ফুঁড়িয়া তার তীব্র হল্‌কা মাথা জ্বালাইয়া দিতেছিল; তখন রৌদ্রে তাতিয়া ঘামিয়া শীকারীর দল আসিয়া পাল্কীতে উঠিল। সব কষ্ট ধীরে ধীরে কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল! সেই স্নিগ্ধ ছায়া-করা বাগানের বুকে সেই পুকুর পড়িবে, তখন তার কোলে সেই কমলের দেখা কি আর একবার মেলে না?

পার হইয়া এপারে আসিলে একজন সঙ্গী বলিল,—এইবার সেই পরীস্থানে একবার উঁকি দিয়ে যেতে হবে!

কথাটা রজনীর ভালো লাগিল না। সে চায় সে রূপ একা দেখিতে—তাহাতে ভাগিদার জুটিবে, এ চিন্তা কাঁটার মত তার বুকে বিঁধিল।

এইবার সেই বাগান। ঐ সেই গাছগুলা—ঐ সেই পুকুর! আশার উল্লাসে মন মাতিয়া উঠিল। গাছের ডালে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল। তার সে করুণ সুর চারিধারে কেমন তন্দ্রালস ভাব

জাগাইয়া তুলিয়াছিল! নিঝুম পুরে চারিধার স্তব্ধ। সেই পরীর বাসভূমি ঐ সেই ভাঙা ঘরখানি—দারুণ স্তব্ধতার মধ্যে মৌন মূক দাঁড়াইয়া আছে! জলে এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই! শান্ত স্থির জল—শ্যাওলায় ভরা—ঠিক যেন কে একখানি সবুজ মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে! ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গায় শুধু শ্যাওলা ছিল না, জলটুকু দেখাইতেছিল ভাঙা আরসীর বুকে মলিন কাচখণ্ডটুকুর মত।

একজন সঙ্গী মৃদু স্বরে গান ধরিল,

ঐ দেখা যায় ঘরখানি!

আর একজন কহিল,—চুপ কর্ ইষ্টুপিড্।

এক জায়গায় আসিয়া সকলের গতি মন্থর হইয়া গেল। পা আর কাহারো চলিতে চায় না! অথচ পুকুরে কেহ নাই! বাড়ীটার মধ্যে সকলে অধীর দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দিল—কেহ নাই! কোন বাতায়নে কাহারো চাঁদমুখ,…কৈ, চিহ্নও নাই তার! বাড়ীটা এমন স্তব্ধ যে ভিতরে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। পুকুরের এধারে পাঁশ-গাদায় একটা কুকুর শুইয়া ঘুমাইতেছে! খোলা দ্বার-পথে ঐ যে একটুখানি উঠান দেখা যাইতেছে, একটা তুলসীগাছ, মাথায় জলের ঝারি। তা ছাড়া, লোকের বাসের এতটুকু সাড়া নাই, কোনো লক্ষণও নাই তার!

সঙ্গীরা বলিল,—এসো, অতিথ হওয়া যাক্।

রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বাড়ী চলো হে!

একজন সঙ্গী বলিল,—নিদেন এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে যাই—ভারী তেষ্টাও পেয়েছে।

সকলে অগ্রসর হইল। সঙ্গীরা ব্যাপারটাকে যতখানি তরল করিয়া

দেখিতেছিল, রজনী ঠিক তেমন ভাবে দেখে নাই। তার মনে তরুণীর রূপ গভীর রেখা পাত করিয়াছিল। সে গৃহে চলিল, অত্যন্ত ভারী মন লইয়া, নৈরাশ্যের একটা তীব্র জ্বালায় প্রাণটাকে পোড়াইতে পোড়াইতে!

কিন্তু কেন এ দাহ! যাহাকে পাইবার নয়, আয়ত্ত করিবার নয়, যে দুর্লভ, তার পানে চিত্ত এমন উধাও ছুটিতে কি বলিয়া!... শুধু যাতনা পাওয়া সার বৈ ত না! আহা, তার চেয়ে সুখে থাক্, সুখী থাক্ ইহারা! সে হতভাগ্য, তার সব-থাকিয়াও কিছু নাই! তরুণ মন থিতাইতে পায়,এমন একটু রূপের অবলম্বনও তার গৃহে নাই,—কোথাও আছে কি!

গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া সঙ্গীরা বাহিরের ঘরে শয্যায় আড় হইয়া পড়িল। রজনীও ক্লান্ত হইয়াছিল—দুই চোখ গাঢ় ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল। সে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। আজ মনে হইতেছিল, ঐ যে রূপসী তরুণীকে সেই পুকুর-ঘাটে দেখিয়া আসিয়াছে, তার রূপ, তার অবয়ব, তার মাধুরীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিবে, স্ত্রী জয়ন্তীর মধ্যে তার কিছু সে পায় কি না! এই জয়ন্তীকে দিয়া তার পরশ একটুও যদি অনুভব করা যায়! সেও তরুণী নারী, জয়ন্তীও তো তাই!

স্ত্রী-জয়ন্তী আসিয়া কাছে বসিল। রজনী তাহার মধ্যে যদি এই অতৃপ্তি-পূরণের কিছু পায়, আজ তাই নূতন চোখ লইয়া প্রাণের দরদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ-সহকারে জয়ন্তীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।...না, না, কিছু না। এ একটা মাটীর স্তূপ, মাংসের ঢিপি! এর না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে মাধুর্য্য!...তার পাশে?... জয়ন্তী একটা কাঠের পুতুল, কাঠের পুতুল! না আছে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব,

না আছে কোন পারিপাট্য ! একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রজনী ভাবিল, ক্যাডাভারাস্ !

যে পথে সে ছুটিয়াছিল, সে পথটার উপরই ঘৃণা ধরিয়া গেল। কি নির্বোধ সে ! রূপের বাসনা তখন আরো তীব্র হইয়া বুকে ফুটিল। নাচ, গান, হাসি তামাসা, সমস্তই একান্ত নিরর্থক, পাগলামি বলিয়া মনে হইল। রূপ ! রূপ ! রূপ ! সারা ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ! সেই তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া রূপের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর কেবলি তরঙ্গ ছুটিতেছে ! পুকুরের তীরে বসিয়া সে ঐ তরঙ্গ দেখিয়াই দিন কাটাইবে ! সে কিছু চায় না ! সব ফেলিয়া, সব ছাড়িয়া ঐ রূপের তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে চায় শুধু ! রূপের কাঙাল মন বুঝিয়াছে, কি ধনেই সে বঞ্চিত !

জয়ন্তী বলিল—পাখীগুলো রান্না হবে তো ?

রূপের হাওয়ায় রজনী ভাসিয়া চলিয়াছিল ; জয়ন্তীর কথা সে হাওয়ায় যেন ধূলি ছিটাইয়া দিল। বিরক্ত হইয়া সে বলিল,—হ্যাঁ।

জয়ন্তী বলিল,—তোমরাই রাঁধবে ত ! বামুন-দিদি কি পাখী রাঁধতে রাজী হবে ?

আবার ! ঝাঁজ-মিশানো বিরক্তির সুরে রজনী বলিল,—যা হয় করগে। আমায় বিরক্ত করো না।

জয়ন্তী বলিল,—ঘুমোবে ? তা ঘুমোও, আমি বাতাস করি।

জয়ন্তী পাখার বাতাস করিতে লাগিল, রজনী রূপের ধ্যানে তন্ময় থাকিয়া কখন্ একসময় ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল,...

ঘর ছাড়িয়া সব ছাড়িয়া সে কোথায় কোন্ নির্জ্জন বনে দারুণ শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, উঠিয়া

জলের সন্ধান করিবে, সে শক্তিও নাই !—হঠাৎ···ও কি ! আকাশ ফাটিয়া আলোর ঝর্ণা ঝরিয়া পড়িল !···চারিধার আলোয় আলো হইয়া গেল। বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া রজনী দেখে, তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই তরুণী ! এ যে পরীর বেশ—প্রজাপতির বিচিত্র পাখার মত দু'খানি পাতলা হালকা পাখা বাতাসের ভরে মৃদু কাঁপিতেছে ! কেশের রাশি শ্রাবণের মেঘের মত পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে ! পরীর হাতে ফুলের ছড়ি, কপালে তারা জলিতেছে—দিনের এ প্রখর আলো, সে তারার দীপ্তির পাশে একেবারে ম্লান হইয়া গেল ! সে রূপের হিল্লোল চোখে দেখিয়া তার সব পিপাসা মিটিয়া গেল, সব ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল। পরীর অধরে মৃদু হাসি—বিশ্ব-ভুবন-ভুলানো, সব-দুঃখ-জুড়ানো মৃদু মধুর হাসি ! রজনী সব ভুলিয়া দুই হাত তুলিল, পরীর ঐ যে আঁচলখানি ভূমে লুটাইয়া পড়িয়াছে, ঐ আঁচলের একটু পরশ যদি পাই···! হাত তুলিতেই সব কিন্তু কোথায় মিলাইয়া গেল !...ছায়া, ছায়া—কিছু নাই !

রজনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল !—চোখ মেলিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কোথায় বন, কোথাই বা পরী !···এ তার ঘর, সে বিছানায় শুইয়া, আর তার পাশে বসিয়া—জয়ন্তী !···কি কুৎসিত !

বিরক্ত চিত্তে সে শুইয়া আবার চক্ষু মুদিল।

অসহ্য ! অসহ্য এ-পিপাসা ! এ কি মরীচিকার পিছনে অধীর মন চঞ্চল হইয়া ক্যাপার মত ঘুরিয়া মরিতেছে ! ওগো দুর্লভ, এ কি মায়ার পাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাকে কষিয়া বাঁধিতেছ ! এ বাঁধন যে গায়ের মাংস কাটিয়া হাড়গুলাকে অবধি চূর্ণ করিয়া দিতেছে !

ঘুম আসে না, চিন্তাও ছাড়ে না ! এমন ত আর কখনো হয় নাই !

কলিকাতায় অমন কত রূপসীর মেলায় সে ঘুরিয়াছে—কত বেশে কত ভঙ্গীতে তারা কত তৃপ্তির পেয়ালা ভরিয়া আনিয়াছে—কিন্তু আজ এ অতৃপ্তির মাঝে যে নেশা প্রাণটাকে ভরপুর করিয়া দিয়াছে, সে নেশা, এ বিহ্বলতা তার যে একেবারেই অজানা ছিল!

সে পরের—পরের ঘরে ফুটিয়াছে, পরের তৃপ্তির কামনার ধন সে—তবু...তার চিন্তাতেও এ কি সুখ! তাহাকে পাইবার নয়, তবু খেলাচ্ছলে মনের মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পাইয়া, তাহারি চিন্তায় তাহারই ধ্যানে পড়িয়া থাকা—ইহাতেও কি সুখ, কি পরিতৃপ্তি! চোখ বুজিয়া রজনী ভাবিতে লাগিল,...সে আমার—সে আমার—সে আমার গো! আলোয় তার কথা ভরা রহিয়াছে, বাতাসে তার কথা মিশিয়া আছে! এ আলো, এ বাতাস আমাকেও ঘিরিয়া আছে, আমাকেও জড়াইয়া রহিয়াছে! নিত্যকার এই আলো-বাতাস বিচিত্র মোহে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল! মাঝে মাঝে মোহের ঘোরে চোখের পাতা যেই খুলিয়া পড়ে, স্বপ্ন অমনি টুটিয়া যায়—কঠোর বাস্তবের ঘা খাইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে, জয়ন্তী! নাঃ! রমণীকে এমন কুৎসিত করিয়াও সৃষ্টি করিতে পারো, ভগবান!

জয়ন্তীকে তার যে একেবারে ভালো লাগিত না, এমন নয়। তবে তার মধ্যে মাদকতার অভাব, ঝাঁজের অভাব। এইটুকুই চোখে ঠেকিত। কলিকাতার বিচিত্র সংসর্গে প্রাণের সে অবাধ লিপ্সার যে স্বাদ পাইয়া আসিয়াছে, তার তুলনায়, এ নির্জীব, প্রাণ-হীন, তবু ইহার মধ্যেও কি যেন একটা সুর ছিল! আজ সে সুরও কাটিয়া গিয়াছে! একটীবারের জন্য দেখা দিয়া সে তরুণী প্রাণটাকে কি রঙেই রাঙাইয়া দিয়াছে! তার ফলে এখন সমস্তই আগাগোড়া ম্লান বলিয়া মনে হইতেছে।

মন ঠাঁই পাইতেছে না কিছুতেই—ঠিকরাইয়া সরিয়া-সরিয়া যাইতেছে।

রজনী উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরের ঘরে গেল! সঙ্গীরা নিদ্রা যাইতেছে। সে আসিয়া তাহাদের তুলিয়া বলিল,—পাখীগুলোর একটা গতি কর।

সঙ্গীরা নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—হবে'খন। তাড়া কেন?

রজনী বলিল,—কাল আরো ভোরে বেরুব, শীকারে। ঐ জায়গাতেই···কেমন?

ঘুমের ঘোরেই সঙ্গীরা বলিল,—আচ্ছা।

— ৪ —

পরের দিন ভোরে আবার সেই শীকার-যাত্রা। সেই মোটর, সেই পথ, সেই বাগান, সেই পুকুর। পুকুরে তরুণী এখনো দেখা দেয় নাই। শীকারীদের দলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। রজনী আর অগ্রসর হইতে চায় না—নৈরাশ্যের ঘা খাইয়া পা দুইটা চকিতে অত্যন্ত ভারী ঠেকিল। চলার সব উৎসাহ নিমেষে যেন উবিয়া গেল। অথচ বাগানের মধ্যে জড়-ভরতের মত দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। লোক চলাফেরা করিতেছে—এই সকালবেলায়! একটা চক্ষু-লজ্জাও ত আছে!

উপায়? একজন সঙ্গী বলিল,—বাড়ীতে চল,—আলাপ করা যাক্।

আর একজন বলিল,—পাগল!

রজনী বলিল,—সে হয় না!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তা বলে তো চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না!

রজনী বলিল,—মোটর-গাড়ীতে গিয়ে বসা যাক্, আবার ফিরে আসব।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না, আমি অমন বাজে ঘোরার মধ্যে নেই। এতটা পথ—কি যে বল!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তবে চল, সটান্ ঘাটে যাই। আজ না হয় সকাল-সকাল ফিরবো'খন। আজ শীকার মিল্‌বে ভালো। কাল একটু বেলা হয়ে গেছল। একে গ্রীষ্মকাল, তায় চড়চড়ে রোদ—পাখী মিলবে কেন বেলা হলে?

রজনী বলিল,—মিছে যাওয়া। কাল বন্দুকের আওয়াজে চারিধার ঝালাপালা হয়েছে। আজ আর পাখী ওখানে আসবে কি!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—তবে শীকারে এলে কেন?

রজনী মৃদু হাসিল। প্রথম সঙ্গী বলিল,—রমণীর মন-শীকারে বেরিয়েছ বুঝি আজ তবে?

রজনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না ভাই, ও পথে আমি নেই। ভদ্দর লোক,—একজনের স্ত্রী—লজ্জা ত্যাগ করা গেলেও ভয়,...সেটাকে ত্যাগ করতে পারচি না।

রজনী করুণভাবে তার পানে চাহিল। সে বলিল,—অভিপ্রায়টা খুলেই বল দিকি!

রজনী কহিল,—শুধু একটু চোখের দেখা দেখবো, এই আর কি?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না ভাই, ও দেখাতেও আশঙ্কা বিলক্ষণ!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—None but the brave…জানো তো?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—একে bravery বল! Coward!

রজনী বলিল,—আমরা ত কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি না। ভগবান একজোড়া চক্ষু দিয়াছেন, তারি সদ্ব্যবহার করছি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—দৈবাৎ চোখে কিছু পড়ে, দৃষ্টি চালাও। তা বলে এমন খুঁজে পেতে এসে চোখ দেওয়া! এ মতি ছাড়ো।

প্রথম সঙ্গী বলিল,—কিন্তু এ তো দুর্ম্মতি নয়। লোভও করছি না। শুধু নিষ্কাম দর্শন-সুখ!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—ও সব তর্ক করতেও চাই না। চল,—এখন হয়, এগোও, নয়, পেছোও। এভাবে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক হচ্ছে না—সেটা ভালো দেখাচ্ছে না।

রজনী বলিল,—কেন, এ বাগানে আমরা পাখী খুঁজচি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—এ বাগানে পাখী!

রজনী বলিল,—কেন, ঘুঘু তো মারতে পারি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—মারো ভাই, ঘুঘুই মারো। কিন্তু কথায় আছে, ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ দেখোনি!

রজনী বলিল,—ফাঁদও নয় দেখলুম! দেখলুম কি, দেখেচি—

প্রথম সঙ্গী বলিল,—শুধু দেখেচ কি, ফাঁদে পড়েছ! বলিয়া মস্ত রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার সে হাসি একটা বিপুল প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া নির্জ্জন বনভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল।

ঠিক সেই সময় সেই দ্বার-পথে তরুণীর ছায়া দেখা গেল। তরুণী

ঘাটে আসিতেছিল,—তাহাদের হাস্য-রবে অপরের সান্নিধ্য বুঝিয়া সরিয়া গেল।

রজনী বলিল,—ঐ হে…

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—চলে চল, চলে চল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বেচারী আসতে পারছে না।

এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় সঙ্গী অগ্রসর হইল—রজনী ও প্রথম সঙ্গী তখন তার অনুসরণ করিল।

ঘাটে সেই পান্সী—তেমনি সাজানো। সকলে পান্সীতে উঠিলে মাঝি পান্সী ছাড়িবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ রজনী বলিল,—যাঃ, কার্টরিজগুলো মোটরে ফেলে এসেছি। তারপর প্রথম সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—মন্মথ, এসো না ভাই, নিয়ে আসি। নাহলে যাওয়াই মিছে! দ্বিতীয় সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিল,—তুমি আসবে, না, নৌকোতেই অপেক্ষা করবে ?

রজনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা অভিসন্ধি মাখানো ছিল,—দ্বিতীয় সঙ্গী হরেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তোমরা যাবেই তো, তা যাও। মোদ্দা শীগ্‌গির ফিরো। আমি নৌকোতেই থাকি। আবার এতটা পথ,…না ভাই, আমার অত সখ নেই, শক্তিও নেই।

মন্মথর মুখে একটা বিষাক্ত হাসির ঢেউ ছুটিয়া গেল। সে বলিল,—এসো রজনী, আমি বন্ধুকৃত্য করি তোমায় সঙ্গ দিয়ে। বেচারী একলাটি যাবে…

রজনী মন্মথকে লইয়া তীরে নামিল; ও নিমেষে দুইজনে বাবলা ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন তখন জলে পা ডুবাইয়া গান ধরিল—

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে
এই বেলা খুলে দে—
খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় রে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দুইজনে ফিরিয়া আসিল, দুইজনেরই মুখে হাসি। তাহারা নৌকায় ফিরিলে রজনী বলিল,—মন্মথটা গাড়োল! কার্টরিজ ঐ ব্যাগে আছে—তা বলেনি! মোটরে খুঁজে পাই না, শেষে বললে, ব্যাগে করে নিয়েছি।...এতটা সময় নষ্ট হলো, তাছাড়া এই পরিশ্রম!

হরেন ক্রুর দৃষ্টিতে রজনীর পানে চাহিল, মৃদুস্বরে কহিল,—এত কৈফিয়ৎ কেন?

মন্মথ মৃদু স্বরে বলিল,—মাঝিদের কাছে ইজ্জৎ রাখতে হবে তো! খালি হাতে ফিরলুম···তারা বেকুব ভাববে যে।

হরেন বলিল,—মনে পাপ ঢুকেছে—নিষ্কাম দর্শনাকাঙ্ক্ষী আর নও তবে? আগে থাকতে দোর সামলাচ্ছ তাই!

আট দাঁড়ে পান্সী চলিয়াছে তরতর করিয়া। রজনী বলিল,—তুমি গেলেনা,—মোদ্দা ভারী miss করেছ! আহা, আজ যেন রূপের জ্যোৎস্না আরো খুলেছিল!

হরেন বলিল,—আমি ওতে নেই। বাইরে আমার রঙ্গ চলে ভালো, ভদ্দর লোকের মেয়ে যেখানে, সেখানে আমি জড়ো-সড়ো হই।

মন্মথ বলিল,—কাল ত চোখ বোজো নি!

হরেন বলিল,—দৈবাৎ চোখে ভালো জিনিষ পড়ল, চোখ ফিরল না! তা বলে সঙ্কল্প এঁটে কোমর বেঁধে আবার তার পাছু নেওয়া!

আজো যদি তখন দেখতে পেতুম, দেখতুম! ভালো বলেই দেখতুম,—অমন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে যেতুম না!

মন্মথ বলিল,—Scoundrel!

রজনী তন্ময় চিত্তে তখনো তরুণীর কথা ভাবিতেছিল। এমন রূপ সে কখনো চোখেও দেখে নাই! গরীবের ঘরে, ঐ ভাঙা কুঁড়েয়, এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য—তার চেয়েও বেশী, বিশ্ব-ভুবনের মণি-মঞ্জুষা কে যেন উজাড় করিয়া দিয়াছে!

তারপর আবার সেই কালিকার মতই সব। সেই বিল, তবে পাখী বড় কম। দুই-চারিটা পাখীও মরিল, তারপরই রজনীর শীকারের সাধ মিটিয়া গেল। আর না—আজ একটু আগে ফেরা যাক! সে পুকুরে যদি আর-একবার সে ভুবন-মোহিনীর দেখা মেলে!

হায় রে নিরাশা! পুকুরের কালো জল,—সবুজ মখমল-বিছানো সেই অপরূপ শয্যা!...কিন্তু, সে নাই! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রজনী থমকিয়া দাঁড়াইল।

হরেন বলিল,—এ-রকম শীকার যদি আবার চলে, তাহলে আমাকে ছুটি দিয়ো ভাই।

মন্মথ তামাসা করিয়া বলিল,—An angel! An angel! ...জানো না ত ভাই,... কোথায় সে মধু আছে বিনা পল্লী-কুসুমে! এ কথা কবি বলে গেছেন।

হরেন একটু ঝাঁজালো স্বরে বলিল,—মধুচক্রে মৌমাছিও আছে, আর তার হুলও আছে, সে কথা কবি ভুলে যেতে পারেন, তোমরা ভুলো না যোদ্ধা! এখন এসো। বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

—নেহাৎ বেরসিক! বলিয়া মন্মথ রজনীর পানে চাহিল, এবং তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

হরেনের অসহ্য ঠেকিল। সমস্ত ক্ষণ রজনীর আর মন্মথর কিসের এত ফিসির-ফিসির? সে বলিল,—আমি ভাই কাল কলকাতা যাব।

রজনী বলিল,—হঠাৎ?

মন্মথ বলিল,—এক সঙ্গে গেলে হতো না?

হরেন বলিল,—না, যখন এক রমণী এসে মাঝে দাঁড়িয়েছেন, তখন এ কথা ঠিক যে বেশীদিন বন্ধুত্ব থাকবে না! এরই মধ্যে তো আমায় একঘরে করে তোমাদের নানা পরামর্শ চলেছে।

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া রজনী বলিল,—না, না, কাল শীকারে বেরুব কি না, সেই কথাই হচ্ছিল আমাদের।

হরেন বলিল,—আবার শীকার! ঐ পথেই? ঐ জায়গাতেই?

হাসিয়া মন্মথ বলিল,—তাই যদি হয়, দোষ কি!

হরেন বলিল,—আমি তাহলে সরে পড়লুম!...তাছাড়া মন্মথ, তুমি ভালো করছ না। যাক্, তুমি চাকরির চেষ্টায় আছ, তুমি থাকো! আমার তার ব্যবস্থা যে মোটে নেই, তা তো নয়। অতএব...

মন্মথ রাগিয়া বলিল,—আমায় তুমি মোসাহেব বলতে চাও! বন্ধুর সঙ্গে এক-মত হই যদি তো সেটা মোসাহেবি!

হাসিয়া হরেন বলিল,—চেপে যাও না!...মোদ্দা রজনী, ভগবান তোমায় পয়সা দিয়েছেন, শরীর দিয়েছেন, বয়সও দিয়েছেন,...অন্য নানা স্থানে তার জোরে নানা সুখ আয়ত্ত করতে পারো মনে করলেই—আলেয়ার পিছনে কেন ছুটচো? পরের ঘরের রূপসীকে দেখে তাকে দেখার লোভ ছাড়তে পার না—এর মানে কি! তাকে পাবে না।

আর পেতেই যদি চাও, তাহলে শয়তান হয়ে পেতে হবে। অতএব—

রজনী একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য! ঠিক ঐ কথাটাই সারাক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বিষম পাগল করিয়া তুলিয়াছে…! সে কি সম্ভব! ভাবিতেই বুক দুড়দুড় করিয়া উঠিয়াছে!—আবার জোর করিয়া মনকে সে সাহস দিয়াছে! পয়সায় কি না হয়! তাছাড়া সে যদি তাহাকে সুখী করিতে পারে, ঐ সোনার অঙ্গ হীরা-জহরতে মুড়িয়া দেয়, রত্ন-পালঙ্কে তাহাকে রাজ্যেশ্বরী করিয়া রাখে…কিন্তু মনের অতি-গোপন এ কথাটার প্রতি হরেন ইঙ্গিত করিল কি করিয়া! তবে কি তার মুখে-চোখে সে গূঢ় অভিসন্ধি, সে সঙ্কল্প এতখানি ছাপ মেলিয়া দিয়াছে যে…না, না—

রজনী বলিল,—কি বক্‌চো, তার ঠিক নেই! না, না, কাল আর শীকারে যাব না। তাহলে হলো ত!

হরেন বলিল,—না ভাই, আমার ও-সব ভালো লাগে না। কি জানো, গান-বাজনা, হাসি-খুসী, গল্প-গুজব কর, কলকাতা থেকে রূপসী আনিয়ে বাগান সাজাও—সে সবে আমায় তোমার পাশটিতে পাবে চিরদিন! তবে সে গণ্ডী এড়িয়ে যদি যেতে চাও, তাহলে আমি তাতে নেই! আমি ভীতু মানুষ, আমার ভয় হয়। তাছাড়া আমার প্রবৃত্তির একটা সীমা আছে। তোমরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে কথা কইছিলে, আমার বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল।

মন্মথ বলিল,—শুধু দেখছিলুম। আমরা তার সঙ্গে হাসি-তামাসা করিনি, ইসারাও করিনি, তবে কিসের ভয়!

হরেন বলিল,—তবু সে ভদ্র ঘরের মেয়ে। আমি মহিলাদের এ সম্মানটুকু দিয়ে থাকি।

মন্মথ বলিল,—সতী সাবিত্রী!

হরেনের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল,—আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, স্বীকার করচি, তাবলে একেবারে শয়তান নই!

মন্মথ বলিল,—আমরা শয়তান...এই কথা বলতে চাও? কে, না চেয়ে দেখে?

—যে দেখে, সে দেখুক। আমি দেখবো না, দেখতে চাই না। পৃথিবী প্রকাণ্ড ক্ষেত্র, দেখার বস্তুরও অভাব নেই!

রজনী বলিল,—তর্ক রাখো। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি গে। ও পথে যাবো না,—ভয় নেই হরেন।

পরের দিন হরেনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

মন্মথ বলিল,—যাক্‌গে, coward!

রজনী বলিল —কিন্তু—

উৎসাহের ভঙ্গীতে মন্মথ বলিল,—এর আবার „কিন্তু কি! বন্ধুর জন্যে বন্ধু কি না করতে পারে? হ্যাঁ, যদি প্রকৃত বন্ধু হয় অবশ্য!

রজনী বলিল,—ঘরে তার স্বামী আছে কিন্তু...

মন্মথ অত্যন্ত গর্ব্ব-স্ফীত কণ্ঠে বলিল,—তুচ্ছ্‌ পরোয়া নেই। একটা গরিবের ঘরের মেয়ে—তাকে পাওয়ার জন্যে আবার ভাবনা! রূপেয়া—রূপেয়া কি কম চীজ, ভাই!

রজনী বলিল,—ভয় করে, ভাই। এক গাঁ লোক। নিজের গাঁয়ে...

মন্মথ বলিল,—তোমার উপর কারো সন্দেহ হবে না,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

রজনী বলিল,—যাক্, সে যা হবার পরে হবে। এখন চল না একবার ওদিকে। একটু ঘুরে আসি।

মন্মথ বলিল,—চল।

দুইজনে তখনি আবার যাত্রা করিল। অদৃষ্ট ভালো—লক্ষ্মী তখন পুকুরে আসিয়াছিল, কলসীতে জল ভরিতে। সে কলসী ভরিয়া পুকুর-পাড়ে দাঁড়াইয়াছিল—মন্মথ ও রজনী আসিয়া একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। হঠাৎ ঝরা পাতায় কার পদস্পর্শে খড় খড় শব্দ হইল। লক্ষ্মীর সেদিকে দৃষ্টি পড়িল,—চোরের মত কারা ও? দুইজনের দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়া লক্ষ্মীর আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল। তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাহাদের পানে নিমেষ মাত্র চাহিয়া সে ঘাটে কলসী রাখিয়াই দ্রুত গৃহ-মধ্যে পলায়ন করিল।

মন্মথর গা টিপিয়া রজনী কহিল,—ফেরো হে।

মন্মথ বলিল,—কেন, ভয় হচ্ছে না কি?

রজনী বলিল,—ছি, ছি. ভারী বেয়াদবি হলো। কি রকম কড়া চোখে চেয়ে গেল,—দেখলে না?

মন্মথ বলিল,—আরে, আজ প্রথম্, ভাই! ও চোখের চাউনি দুদিনে মিহি করে তুলবো, তবে আমার নাম মন্মথ!

রজনী বলিল,—না হে, চলে এস।

মন্মথ কহিল,—ভয়...?

রজনী বলিল,—ভয় ঠিক নয়! তবে হাজার হোক, আমায় সকলে চেনে—শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে!

মন্মথরও যে ভয় না হইতেছিল, এমন নয়! বাড়ী গিয়া যদি কাহাকেও বলিয়া দেয়? পাড়ার লোক যদি আসিয়া পড়ে?...সে বলিল,—চল তবে।

দুইজনে চোরের মত তখন সেখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

— ৫ —

সেদিন রবিবার। তরুণ-সঙ্ঘের চড়ি-ভাতির আয়োজন ছিল। বেলা ন'টার সময় পলাশডাঙা হইতে দশ-বারোটি ছেলে আসিয়া নৌকা হইতে নামিয়া অঙ্গিনায় পৌঁছিল। দলের সঙ্গে যতীশও আসিয়াছিল। এখানে জীবনের এই মুক্ত হিল্লোল, এই সরল প্রাণের অকপট সঙ্গ—এ-সব দেখিয়া সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তার ধারণা ছিল, যা কিছু বুদ্ধি, তা কলিকাতার ছেলেদের মাথাতেই খেলে,—নূতন কাজ, নূতন আইডিয়া—সে-সব এ পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের মাথায় আসিবে কোথা হইতে! জীবনের তারা কি জানে! কিন্তু এই তরুণ-সঙ্ঘটিকে পাইয়া তার মত বদলাইয়া গেল। এমন আপশোষও জাগিল যে অন্ততঃ দুই-তিন বৎসরও যদি সে ইহাদের সঙ্গে কাটাইতে পারিত! শুধু ফুটবল খেলিয়া আর ডন কষিয়াই মানুষ হওয়া যায় না! গোরাদের ম্যাচে হারানোতেই আনন্দের চরম নয়! এখানে এই যে পরের জন্য পরের ভাবিতে শেখা, কাজ করিতে শেখা, নিজের স্বার্থ বলি দিয়া নিজের পানে একটুও না চাহিয়া এই যে জীবন-তরঙ্গে ভাসিয়া চলা, ইহারই নাম জীবন। নহিলে বাবুয়ানায় পাকা বা সাহেবকে গালি দিতে পারাটাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।

সে সব যেন কৃত্রিম অভিনয়, প্রাণের সহিত প্রাণের আন্তরিক যোগ সেখানে কোথায়! তবে এখানে যে তার থাকিবারও উপায় নাই! পাশ করিয়া তাহাকে কলেজে ঢুকিতে হইবে, এখানে তো আর কলেজ নাই!

তার পর এই দলটি! চমৎকার দল! আশ্চর্য্য সকলের মনের মিল! আর ঐ মাষ্টার মশায়টি,—রঘুনাথ বাবু। কি অনাড়ম্বর তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী! ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মেশার ভঙ্গীটিও কি সুন্দর! সকলকে সমান চক্ষে দেখা, সকলের উপর সমান দরদ,—কলিকাতার স্কুলে এ তো দেখাই যায় না। সেখানে একটা ভুল-চুক্ হইলে শুধুই তীব্র ভর্ৎসনা আর শাস্তির ঘটা! আর ইনি? সে তো স্কুলে গিয়াও দেখিয়াছে, যার ভুল হইল, তাকে বুকের কাছে টানিয়া কি-ভাবেই না তাকে সব বুঝাইয়া দেন! এতটুকু বিরক্তি নাই, এতটুকু অধৈর্য্য নাই!

রঘুনাথের উপর তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। আজ এ চড়িভাতির প্রস্তাবে তার আমোদ হইয়াছিল সব-চেয়ে বেশী। এ যে তার কল্পনার অতীত!

ছেলেরা আসিয়া নদীতে ঝাঁপাই জুড়িয়া নদীর জল একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিল। জলের ঢেউয়ে জলের গায়ে তরুণ প্রাণের চপল হিল্লোল লাগায় জলও সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে যেন নাচিয়া উঠিল। সঙ্গীত-কলরবে জল তটের কাণে সে আনন্দ জানাইতে লাগিল।

স্নান সারিয়া ঘণ্টাখানেক পরে ছেলের দল বাগানে আসিল। চড়ি-ভাতির জন্য হাঁড়ি-কুড়ি চাল-ডাল সব সাজানো। একজন গিয়া শুকনো পাতা কুড়াইয়া আনিল। দুই-তিন জন গাছে চড়িয়া শুক শাখা সংগ্রহ

মন দিল,—টুকরা কাঠের স্তূপে তারা অমন ছোট-খাট একটা পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তার পর মাটী খুঁড়িয়া ইট সাজাইয়া উনান তৈরী হইল। লক্ষ্মী আসিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া তাহাতে চাল ডাল ফেলিয়া দিল—খিচুড়ী হইবে।

যতীশ একধারে ঘুরিয়া পল্লীর এই বিজন কানন-ভূমিটিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। সহরের শুষ্ক কঠোর পথ আর ইট-কাঠে-রচা প্রাচীরের শ্রেণী দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু কেমন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এখানে এই বৃক্ষলতায় অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য, পুকুর ও খড়ে-ছাওয়া বাঁশে-ঘেরা মাটির কুটীরগুলির মধ্যে এমন শান্ত শ্রী বিরাজ করিতেছে যে তা দেখিয়া ক্লান্ত দৃষ্টি স্বাস্থ্যে ভর-পুর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। এই খোলা জায়গা—গাছের ডালে ডালে পাখীর গান, পাতায় পাতায় বাতাসের কাণাকাণি···তার প্রাণে এমন এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে সে এক সময়ে একটা পড়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল, আর তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত বহির্জগতের লোকজন, তাদের কল-কোলাহল সব কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

হঠাৎ তার নজর পড়িল, অদূরে একটা জাম গাছের পানে। পুকুরের ধারে জাম গাছ—তার একটা মস্ত ডাল পুকুরের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। ডালে থোলো থোলো কালো জাম—আর ছোট একটি মেয়ে একটা আঁকশী লইয়া জাম গাছের ডালে লাগাইতেছিল, সেই জাম পাড়িবার জন্য। ছোট মেয়ে, আঁকশীটিও ছোট, জামের গোছায় নাগাল পাওয়া যায় না! কৌতুকের ভাবে যতীশ তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। অন্য ছেলের দল তখন চড়ি-ভাতির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাদের কলরব শ্রান্ত মৌমাছির অলস

গুঞ্জনের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছিল। লক্ষ্মী ও রঘুনাথ তাদের কাছে দাঁড়াইয়া সব তদ্বির করিতেছিল।

হঠাৎ যতীশের চোখের সামনে সমস্তটা যেন উল্টাইয়া গেল! মেয়েটি ডালে আঁকশী লাগাইয়া এক পা এক পা আগাইয়া চলিয়াছিল, তবুও জামের নাগাল পাইতেছিল না। তাহার সে মৃদু চঞ্চল গতি-ভঙ্গী যতীশের বুকের মাঝখানটায় যেন এক অজানা ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল। যতীশ তার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না! তার বুক কেমন দুরদুর করিতেছিল। তাই তো, মেয়েটী অমন আনমনা-ভাবে কোথায় আগাইয়া চলে!

হঠাৎ ঝুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে বালিকার ক্রন্দনে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। যতীশ ছুটিয়া পুকুর-পাড়ে গেল—মেয়েটি গড়াইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে।...ঐ যে, ঐ সে! যতীশ অমনি টক্ করিয়া ঝাঁপাইয়া পুকুরের জলে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি জল খাইতেছে, চুলগুলা ছড়াইয়া মুখে পড়িয়াছে, এক একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে। মুখ তার মৃত্যুর উদ্যত কর-স্পর্শে কেমন এক বিভীষিকায় ভরিয়া গিয়াছে।

যতীশ জলে সাঁৎরাইয়া গিয়া বালিকার চুলের মুঠি ধরিয়া টান দিল; এবং টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে লইয়া আসিল।

বালিকা জল খাইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যতীশ তাহাকে কোলে করিয়া বহিয়া বাগানে উঠিল এবং সকলে যেখানে খিচুড়ী রাঁধিতে ব্যস্ত, সেখানে লইয়া আসিল। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি...!

মেয়েটি মন্টী। কি করিয়া এমন হইল? যতীশ সব কথা খুলিয়া

'লক্ষ্মীকে লইয়া মোটর তীরের মত ছুটিল'

(৬৫ পৃষ্ঠা)

কর্মলিনা চিত্রাগার।

'তারা প্রিন্টিং ওয়ার্কস"

বলিল। তখন ছেলের দল তার গায়ের মাথার জল মুছাইয়া দিতে লাগিল—রঘুনাথ তার হাত ধরিয়া ঘুরাইয়া আরো নানা প্রক্রিয়ার পর পেটের জল বাহির করিয়া দিল। ঘণ্টা-খানেক পরে মেয়ে সুস্থ হইলে লক্ষ্মী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে গেল; এবং হেফাজতে কিছুক্ষণ রাখিবার পর মেয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মী মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিল;—পাজী মেয়ে! আর কখনো পুকুরের ধারে যাবে?

মন্টী বলিল,—না।

রঘুনাথ আসিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিল, বলিল,—এই যে মন্টী বেশ কথা কইছে।...তুমি তাহলে এদিকে এসো গো, খিচুড়ী তোয়ের; ভাজাও হয়ে গেছে।

এখন কতকগুলা পাতা কাটিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে বসিলেই হয়।

ঘরে দই পাতা ছিল; আচার, সড়া তেঁতুলও ঘরে ছিল। লক্ষ্মী সে সব লইয়া বাগানে আসিল। একটি ছেলে এক রাশ কলাপাতা কাটিয়া আনিল।

প্রকাণ্ড একটা আমগাছ ডাল-পালা মেলিয়া এক জায়গায় যেন চন্দ্রাতপ খাটাইয়া রাখিয়াছিল। সেই ছায়ায় গাছতলায় ছেলেরা সার-সার বসিয়া গেল। লক্ষ্মী পরিবেষণ করিতে লাগিল। মন্টীকে যতীশ তার পাশে বসাইয়াছিল। যতীশ বলিল,—ভাগ্যে আমি চড়ি-ভাতির দলে না থেকে ঐ গাছতলায় বসেছিলুম।

কথাটা শুনিয়া লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমার জন্তেই ওকে ফিরে পেয়েছি। নৈলে কি ওর আজ বাঁচবার কথা!—বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন, বড় করুন!

যতীশ বলিল,—তা কেন! আমাদের তরুণ-সঙ্ঘের জন্তেই ও বেঁচেছে। আমি কি আগে সাঁতার জানতুম? মোটেই না! এখানে এসেই না মাষ্টার মশায়ের কাছে সাঁতার শিখেচি।

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্তে তোমার গুরু-দক্ষিণাও আজ যা দেওয়া হলো, এর আর তুলনা নেই!

গল্পে-গুজবে ছেলেদের কল-গুঞ্জনে এই নির্জ্জন স্তব্ধ বনভূমিতে যেন আজ নন্দনের সুরভি ছিটাইয়া পড়িয়াছিল! লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, এত সুখ,...তার ভাগ্যে এত সুখও ছিল!

ছেলেদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কয় টুকরা মেঘ আসিয়া রৌদ্রের উপর একটা কালো পর্দ্দা বিছাইয়া দিল; দেখিতে দেখিতে সে-মেঘ চারিদিকে এমন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল যে চরাচর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মাথার উপর পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশের কোল ঘেঁষিয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট গৃহ-কোণ লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছিল। বাগান হইতে গাছপালার ফাঁক দিয়া নদীর একটু অংশ দেখা যাইতেছিল—ঘোলাটে জল স্থির স্তম্ভিত,—যেন কি এক ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেছে, ভয়ের বস্তুটাকে দেখিতে পাইলেই এখনি চঞ্চল হইয়া উঠিবে! তার কোলে ওপারে একটা ইটের পাঁজা হইতে বাষ্প-ধূম উঠিতেছিল—যেন দৈত্যদের প্রকাণ্ড উৎসব-ভোজ উপলক্ষে মস্ত উনানে তারা আগুন দিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। রঘুনাথ বলিল,—ভয়ানক জল ঝড় আসচে। তোমরা হাত চালিয়ে নাও।

কিন্তু ছেলেরা হাত চালাইবার পূর্ব্বেই হু-হু শব্দে ঝড় আসিয়া পড়িল। রাজ্যের ধূলা-বালি উড়াইয়া, গাছের ডালে-পাতায় প্রচণ্ড

আর্ত্তনাদ জাগাইয়া, জীর্ণ ডালের টুকরা ছিটাইয়া গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে ঝড় আসিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিল। তার হুঙ্কারের বেগে জলও নামিল তেমনি মুষলধারে, চকিতে!

ছেলেরা পাতা ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রঘুনাথের বাড়ীর দাওয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মী যতখানি সম্ভব জিনিষপত্র বাঁচাইয়া ঘরে ছুটিল—ভিজিয়া একশা হইয়া।

যতীশ সিক্তকেশা সিক্তবেশা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। লালপাড় শাড়ীখানি তার গৌর-অঙ্গ বেড়িয়া আছে! শাড়ী ভিজিয়া তার গায়ের সঙ্গে ন্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছে—আর কাপড়ের সাদা রঙ ফুঁড়িয়া তার গায়ে সোনার বর্ণ শাড়ীর লাল পাড়ের ধার দিয়া যেন সোনালি ঢেউ ছুটাইয়া দিয়াছে। তার মনে পড়িয়া গেল, বহুদিনকার একটা হারানো দিনের কথা!

তখন তার বাবা বাঁচিয়া। কলিকাতায় বাপের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল এমনি বৃষ্টিতে। কলিকাতা সহর সেদিন ভাসিয়া গিয়াছিল, একখানাও গাড়ী মেলে নাই। ভিজিয়া বাড়ী ঢুকিতেই মা সেই বৃষ্টিতে তাহাকে সদরের দ্বার হইতে উঠান পার করিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া যাইতে ভিজিয়া সারা হইয়া গিয়াছিলেন···সে দিন মারও পরণে ছিল এমনি একখানি লাল-পাড় শাড়ী, আর সে শাড়ী তাঁর গৌর-অঙ্গে ভিজিয়া ন্যাপ্‌টাইয়া গিয়াছিল! আজ লক্ষ্মীর পানে চাহিতেই মার সেই অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মার সে লাবণ্য যেন বিদ্যুতের মত তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল! লক্ষ্মীর মুখে মার সেই তখনকার সুন্দর মুখেরই ছবি যেন কে তুলিয়া লইয়াছে! মনের মধ্যে তার একটা ডাক উথলিয়া উঠিল—মা, মা···!

সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি ঝড়-বৃষ্টি থামিল। ছেলেরা কলরব তুলিয়া বাহিরে আসিল। জলে ভিজিয়া চারিধার কেমন স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপে ভরিয়া উঠিয়াছে, মেঘ-জলের অন্তরালে গোধূলির স্বর্ণরাগ সারা বিশ্বে এক অপরূপ লাবণ্য ছড়াইয়া দিয়াছিল! এতখানি মুক্ত প্রান্তরে এমন বিচিত্র বর্ণরাগের লীলা যতীশের চোখে একেবারে নূতন! সে এ দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইল। তারপর রঘুনাথ সকলকে লইয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তীরের কাছে-কাছে কাদা-ধোয়া ঘোলা জলে সাদা ফেনার রাশ, নদীর ম্লান হাসির মতই ফুটিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। ঝড়ের সঙ্গে লড়িয়া নদী যেন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! তার তরঙ্গ-কল্লোল ভারী শান্ত, ভারী করুণ!

— ৬ —

দুই-চারিদিন ধরিয়া অলস জল্পনা করিবার পর লক্ষ্মীর সে রূপ রজনীর মন হইতে উবিয়া যাওয়া দূরের কথা, সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল। সেদিনকার সেই দুই চোখের কঠিন ভৎসনার দৃষ্টি বুকের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ শরের মত বিঁধিয়াছিল যে সেদিক-পানে চাহিতে সাহসে কুলায় না! অথচ কয়দিনের অদর্শন তার পিপাসাকে এমন তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল যে রজনীর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, বুঝি সে পাগল হইয়া যাইবে! কোন কাজে মন নাই, কিছুই ভালো লাগে না। শীকার, গান-বাজনা, এ-সবে কোন সুখ নাই! ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য ঠেকে, অথচ বাহিরটাও নেহাৎ ফাঁকা, নেহাৎ নিরবলম্ব মনে হয়! চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, অথচ বাড়ীর বাহির হইতে গেলে পা দুইটা ভারী বোধ হয়! মনে হয়,যাই কোথায়—কোথায় গেলে

একটু জুড়াইতে পাই! এমনি দ্বিধার মধ্যে মন যখন একটা জায়গার দিকে সঙ্কেত করে, চলো সেইখানে—পা তখন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া পড়ে, বুকের মধ্যটা কি এক ভয়ে দুলিয়া ওঠে! রজনী সত্যই ভাবে, এবার সে পাগল হইবে!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রজনী বাহিরের ঘরে পড়িয়া অস্থির মন লইয়া ছটফট করিতেছিল,—মন্মথ কোথায় গিয়াছে, কে জানে! ঘর অন্ধকার। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিতে আসিলে রজনী মানা করিল।

হঠাৎ একটু পরে চোরের মত মন্মথ আসিয়া হাজির। সে ডাকিল,—রজনী—

রজনী বলিল,—কি?

মন্মথ বলিল,—সব ঠিক হে। এই ছ্যাখো, কে এসেছে।

আঁধার ভেদ করিয়া রজনী লক্ষ্য করিল, দ্বারের কাছে মন্মথর পিছনে এক রমণী-মূর্ত্তি। সে একটু কৌতূহলের ভাবে বলিল,—কে?

মন্মথ রজনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—কুটনী! এ ঠিক এনে দিতে পারবে—বহুৎ সন্ধানে একে পেয়েছি।

রজনী উঠিয়া বসিল, রমণীকে কাছে ডাকিল। রমণী নিকটে আসিলে সে বলিল,—সব শুনেচ?

রমণী একগাল হাসিয়া বলিল,—শুনেচি বৈ কি। কাকে চাই বল তো দাদাবাবু…কার ওপর সদয় হলে?

রজনী চারিদিকে চাহিয়া খুব চাপা গলায় খুলিয়া বলিল, কাহাকে পাইবার জন্ম সে এমন অধীর, আকুল! বারবার কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছিল। চোখের সামনে জল-জল করিয়া ফুটিয়া উঠিল একটি পরিচ্ছন্ন ঘরের কোণ—সেই কোণে বসিয়া তরুণী রূপসী স্বামীর

চিন্তায় মশ্‌গুল! স্বামীর মুখে তৃপ্তির কি হাসি!...সুখের ঘর!...এ ঘর তার একটি ইঙ্গিতে চূর্ণ হইয়া যাইবে! আর সে? আহা, না, না!

রমণী বলিল,—কাকে গা দাদাবাবু?

রজনীর বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল। কে যেন বুকে মুগুরের ঘা মারিল! রজনী ভাবিল, থাক, কাজ নাই!...এ চিন্তা মনে হইতেও সে শিহরিয়া উঠিল! অসম্ভব! তাকে না পাইলে দিনগুলা যে অসহ্য ঠেকিতেছে! জীবন ভারী কর্কশ বোধ হইতেছে! কি লইয়া সে থাকিবে? সে ভাবিল. দোষ কি! বেচারী অত রূপ লইয়া অবহেলায় জঞ্জালের মাঝে পড়িয়া আছে—আর সে ও-রূপ মাথার মণি করিয়া রাখিবে যে!

ধীরে ধীরে সে বলিল,—অর্থাৎ বুঝেচ, রঘু-মাষ্টারের বৌ...ঐ কঙ্কণার কাছে বাড়ী—

রমণী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে অক্ষমতার স্বরে নিরাশ কণ্ঠে বলিল,—ও হবে না বাবু—আর কাকেও ফরমাশ কর।

রজনী অধীরভাবে বলিল,—কেন হবে না?

রমণী কহিল,—বড় ভাল লোক দাদাবাবু, রঘু মাষ্টার। বৌটিও বড় লক্ষ্মী। নামে যা, কাজেও তাই। আর গরিব হলেও সোয়ামী-অন্ত প্রাণ। সতী-লক্ষ্মী...ও বড় শক্ত কাজ...তা ছাড়া তার পানে চাইলে মন ভয়ে ওঠে—ওকে হবে না!

রজনী রাগ করিল; এবং রুষ্ট স্বরেই বলিল,—তবে কি করতে এসেছ এখানে?

রমণী বলিল,—এ কথা জানলে আসতুম না। ইনি তো বলতে পারলেন না, কাকে চাই।

রজনী ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে মন্মথর পানে চাহিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি মন্মথ দেখিতে পাইল না।

রজনী বলিল,—কেন একে নিয়ে এলে তবে?

মন্মথ সে কথার কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

রজনী বলিল,—তুমি ফ্যাসাদ বাধালে! মিছিমিছি একে জানান্ দিলে! তার পর…? ছি ছি, কাঁচা কাজ, ছ্যাখো দিকি তোমার!

মন্মথ নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রজনী রমণীকে বলিল,—এই নাও দশ টাকা। কিন্তু সাবধান, যদি এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায়, তাহলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাষ আর এক জায়গায় হবে। মনে থাকে যেন। বলিয়া রজনী তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল।

রমণী নোটখানা আঁচলের প্রান্তে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো দাদাবাবু—আমায় মেরে ফেললেও এ কথা প্রকাশ হবে না। বিশেষ তোমার গাঁয়ে থাকি! চাচা আপন বাঁচা! কথাটা বলিয়া সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজনী বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও।

রমণী বলিল,—শুধু শুধু পয়সা খাব, দাদাবাবু! আর-কাকেও এনে দি…ঐ আমাদের পাঁচুগোপালের বৌ—চমৎকার সুন্দর, সোয়ামীটে কলকাতায় থাকে—বৌটাকে নেয়ও না—যেন পরীটি! আর বেশ হাসি-হাসি মুখ—চট করেই পোষ মানবে'খন।

রজনী বিরক্ত স্বরে বলিল,—না, না, কাকেও চাই না। আমার কি ঐ পেশা! তুমি যাও।

রমণী অগত্যা চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে রজনী ডাকিল,—মন্থু, বসো দিকি—কথা আছে।

মন্মথ বসিল। রজনী কহিল,—অনেক ভেবেচি। এক ব্যাটা আছে বিন্দে, সে চাঁড়াল। ষণ্ডা, গুণ্ডা। তার দলে দু'চারজন লোক আরো আছে। তাকে ডাকিয়েছিলুম—তাদের ক' বোতল মদ আর কিছু টাকা দিলে তারা যা হুকুম করবো, তাই করবে। আমি বলি কি, তাদের বলি, তারা ঠিক এনে দেবে।...ভাবচি, একটা রাত্রে তারাই এ কাজ করবে। আমার মোটরখানা আজই সরিয়ে দি, কলকাতায় ফিরবে মেরামতির জন্যে, এই কথা বলে! তার পর তিন ক্রোশ দূরে ঐ যে পোড়া-কালীর মন্দির আছে, তার ওধারে বড় রাস্তায় মোটর থাকবে, সন্ধ্যার পর। ওধারে লোকের ভিড় নেই। এ দিকে মাঝরাত্রে ওরা কাজ ফতে করে তাকে এনে মোটরে চড়িয়ে দেবে। মোটর একেবারে দু'খানা গাঁয়ের পর একটা ভাঙ্গা বাড়ী আছে, জঙ্গলের মধ্যে, সেইখানে নিয়ে গিয়ে ওকে রাখবে। আমরাও পরের দিন দুপুর বেলায় কলকাতায় যাচ্ছি বলে বেরুব। বেরিয়ে সেইখানে যাব। এতে লোকেরও কোন সন্দেহ হবে না আমাদের উপর...তার পর যেমন অবস্থা দেখব, ব্যবস্থাও তেমনি করা যাবে।

মন্মথ বলিল,—বাঃ, এ যে চমৎকার প্ল্যান! তুমি একখানা উপন্যাস বানিয়ে ফেললে একেবারে। খাসা!

রজনী বলিল,—একটা চাকরকে ডেকে এবার আলো জ্বাল্‌তে বল। না, না, থাক্‌। চল, একবার বিন্দের ওখানে ঘুরে আসি। সে বেটার আর এখানে এসে কাজ নেই—যদি কেউ দেখে ফেলে! তার চেয়ে ওর ওখান থেকেই বন্দোবস্ত পাকা করে আসা যাক্‌!

বন্দোবস্ত পাকা করিয়া ফিরিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া আহার সারিয়া রজনী বাহিরের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিল। সামনের গাছে লাল টকটকে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়া বর্ণে-গন্ধে দিক মাতাইয়া তুলিয়াছিল। মাথার উপর দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারিধার ঝলমল করিতেছে! রজনী ফুলটার পানে চাহিয়া ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতেছিল। জলের কোলে সেই যে পদ্মটী দেখিয়াছে, তার কাছে এ গোলাপ কত তুচ্ছ! ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্না কখন যে গোলাপের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। ফুলটাও সেই সঙ্গে তার পাপড়িগুলাকে বিস্তার করিয়া ধরিয়াছে—আর তার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখ! কি হাসি তার ঐ রক্তিম অধরে! ঐ কুঞ্চিত কৃষ্ণ ঘন কেশরাশির মধ্যে চাঁপার-বরণ মুখখানি··· যেন পাতার কোলে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে! রজনী তার অধীর দুই বাহু বাড়াইল—ও ফুলটি বুকে চাই! অমনি চকিতে তার স্বপ্ন টুটিয়া গেল—কোথায় তার মুখখানি! এ যে একটা গোলাপ ফুল—নেহাৎ তুচ্ছ! রজনী একদৃষ্টে ফুলটার পানে চাহিল—মনে হইল, ফুলটা যেন তার পানে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে!

ওদিকে ঠিক সেই সময় রঘুনাথের জীর্ণ গৃহের মাটীর দাওয়ায় লক্ষ্মী একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল, মন্টী গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—রঘুনাথ এখনো বাড়ী ফেরে নাই! চাঁদের আলোয় আলো-করা আকাশের পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, তার জীবনের কত কথা। বিবাহের রাত্রে তার কি ভয় হইয়াছিল—বর, স্বামী। সে তো দেখিয়াছে, ঐ পাশের বাড়ীর মামী মামীর কাছে কি

মারই না খায়! পান হইতে চুণ খসিলেই নিস্তার নাই! ভীম গর্জ্জনে মামার তিরস্কার আর লাথি, চড়—কি সে প্রচণ্ড প্রহার! তাহা দেখিয়া বিবাহের নামে তার হৃৎকম্প হইত! কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় ভয়-ভরা কৌতূহলের মাঝে রঘুনাথের স্নিগ্ধ চোখের সরস দৃষ্টি কি পরশ যে বুলাইয়া দিল! কোথায় গেল তার যত দুর্ভাবনা, যত শঙ্কা! রঘুনাথ কি আদরেই তাহাকে রাখিয়াছে!...শুধু হাসি,শুধু আনন্দ! দারিদ্র্য সেখানে হানা দিতে পারে না! এমনি কত কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! চাঁদের আলো তার মুখে জ্যোৎস্নার ঝর্ণা ঝরাইয়া দিয়াছে! ঠোঁটের কোণে হাসির লহর! বুঝি, কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে!

হঠাৎ রঘুনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল; মুগ্ধ বিস্ময়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিল। জ্যোৎস্নার ধারায় ধোওয়া মুখখানি—অপূর্ব্ব সুষমায় ভরা! রঘুনাথ দেখিয়া দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—ভাবিল, হায়, এ রত্ন, এ যে রাজার ঘরের যোগ্য! এ রত্ন তার হাতে পড়িয়া কি অবহেলাই না ভোগ করিতেছে! বেচারী ...বেচারী লক্ষ্মী...! কেন সে হতভাগা লক্ষ্মীর জীবন-পথে আসিয়া উদয় হইল! এই জীর্ণ ঘর, এই দারিদ্র্য...এ কি লক্ষ্মীকে মানায়!... কিন্তু উপায় কি? উপায়...?

রঘুনাথ লক্ষ্মীর পাশে বসিল—তার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অধীর আবেগে লক্ষ্মীর মুখে চুম্বন করিল। লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব! উঠিয়া চোখ মুছিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু...

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল,—বড্ড লোভ হলো, লক্ষ্মী!

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও,...বলিয়া স্বামীর গায়ের জামা খুলিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল আনিতে ছুটিল। তার পানে চাহিয়া রঘুনাথ বলিল,—এত ব্যস্ত কেন, লক্ষ্মী? একটু বসো না...

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,—এতখানি পথ হেঁটে এলে! মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও আগে, তার পর সারা রাত তোমার কাছে বসে থাকবো'খন।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, হায়রে, এ লইয়াই লক্ষ্মী পরিতৃপ্ত! এ লইয়াই সে ভাবে, সে পরম সুখে আছে!

— ৭ —

পরদিন সন্ধ্যার পরক্ষণে ঝড় উঠিল। পলাশডাঙ্গায় যতীশের গৃহে সেদিন কি একটা কাজে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। স্কুলের সব ছেলেগুলি সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই জড়ো হইয়াছে—রঘুনাথেরও ডাক পড়িয়াছিল। মন্টীর নিমন্ত্রণও বাদ যায় নাই।

যতীশের মা মন্টীকে নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া সাজাইয়া কোলে লইয়া আদর করিয়া এমনি মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে সে নিজের মার অদর্শন বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। যতীশ আসিয়া বলিল,—মন্টী ঘুমিয়ে পড়েচে। মা বললেন, এই রাত্রে তাকে নাই নিয়ে গেলেন। কাল সকালে আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

রঘুনাথ বলিল,—মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যদি কাঁদে? বিরক্ত করে?

যতীশ বলিল,—মা বল্লেন, তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবেন তিনি।

রঘুনাথ বলিল,—বেশ, থাক্ তবে।

তারপর বিদায় লইয়া রঘুনাথ পার-ঘাটার পানে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি! পল্লীর শ্যাম প্রান্তর আলোয় আলো হইয়া আছে! ছাত্রের দল রঘুনাথকে আগাইয়া দিতে সঙ্গে আসিল। যতীশও আসিতে ছাড়িল না। পার-ঘাটার দিকে যে পথটা গিয়াছে, সেই পথে পা দিবা মাত্র সকলের চোখ পড়িল, ও-পারের বাঁকের মুখে আকাশের পানে! ও কি, রুদ্রের রক্ত আঁখি যে দৃষ্টিতে অনল বর্ষণ করিতেছে! চাঁদের শুভ্র আলোয় কে যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছে! আকাশ একেবারে লালে লাল!

যতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও যে আগুন লেগেছে, মাষ্টার মশায়।

তাই তো, আগুনই তো! ও যে, ও যে···রঘুনাথের ঘরের কাছে··· রঘুনাথের বুকটা দুড়দুড় করিয়া উঠিল! ও ঘরে তার লক্ষ্মী, তার সব···! কালিকার মতই লক্ষ্মী যদি ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকে! যদি বাহির হইতে না পারে···!

রঘুনাথ উন্মাদের মত ছুটিল। ছাত্রের দলও ছুটিয়া তার অনুসরণ করিল। ঘাটে দুই-তিনখানা নৌকা ছিল; মাঝি নাই! সকলে মিলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গাছ-পালায় আগুন, ঘরে আগুন—চারিদিকে আগুনের কি ও লেলিহান্ শিখা! সমস্ত গ্রামটাকে গিলিয়া তবে বুঝি আগুনের এ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটিবে!

তীরে আসিয়া সকলে দেখিল, তাই তো, এ যে রঘুনাথের ঘরই জ্বলিতেছে!···লক্ষ্মী···?

রঘুনাথ ছুটিল। হায়রে, ও আগুন নিবাইবার সাধ্য কি! কি

দিয়া নিবানো যায়! দুই-চারিজন প্রতিবেশী কলসী লইয়া জল ঢালিতেছে—কিন্তু এ দারুণ অগ্নি-ক্রীড়ায় সে কতটুকু বাধা! আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ফট্‌ ফট্‌ করিয়া বাঁশ ফাটিতেছে, চালার পর চালা জ্বলিয়া ছাই হইয়া বাতাসের মুখে উড়িয়া চলিয়াছে!

সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রঘুনাথ পাগলের মত গিয়া ঝাঁপ দিল। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী···কোথায় লক্ষ্মী? আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল,—কোথায় লক্ষ্মী? লক্ষ্মী নাই! সে তবে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে...?

রঘুনাথ পাগলের মত বাহিরে আসিল। ছেলের দল আরো কয়টা কলসী ইতিমধ্যে জোগাড় করিয়া জল তুলিয়া ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রঘুনাথের হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করিতেছিল। সে একদিকে মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ কখন্‌ আপনা হইতেই খোরাক না পাইয়া আগুন নিবিয়া আসিল। যতীশ আসিয়া রঘুনাথের গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—মা···?

রঘুনাথ পাগলের মত তার পানে চাহিল; তারপর আকাশের দিকে দেখাইল। গাঢ় স্বরে বলিল,—নেই।

যতীশ অধীর কণ্ঠে বলিল,—নেই কি! উঠুন, আসুন, দেখি।

ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিল, বনে জঙ্গলে পাতি-পাতি খুঁজিল—লক্ষ্মীর কোন চিহ্ন কোথাও নাই!

গ্রামের একজন বলিল, বনের পথে সে একটা পাল্কী চলিতে দেখিয়াছে, ঠিক ঐ আগুন লাগার পূর্ব্বক্ষণে! শুনিয়া রঘুনাথ বসিয়া পড়িল। ছেলেরা তাকে ঘিরিয়া বসিল, অত্যন্ত নিরুপায়ের ভাবে।

এমনি ভাবেই বনের মধ্যে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোর হইতেই

যতীশ আবার লক্ষ্মীর সন্ধানে বাহির হইল। চারিধারে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সে ফিরিল, রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—পেলে?

যতীশ গাঢ় স্বরে বলিল,—না—তার পর চোখে তার বাণ ডাকিল।

রঘুনাথ তখন উঠিল,—দগ্ধ গৃহের ভস্মস্তূপ ঘাঁটিল···যদি তার দগ্ধ কঙ্কালখানার চিহ্নও পাওয়া যায়!...সন্ধান করিয়া কিছু পাইল না—সে তখন সেই ভস্মস্তূপের উপর মাথা গুঁজিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে রঘুনাথ দেখিল, যতীশ ও অপর ছাত্রেরা তার মুখের পানে কি ভয়াকুল অধীর নেত্রে চাহিয়া আছে। প্রথমটা তার মুখে কোন কথা সরিল না। যতীশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ম্লান দৃষ্টিতে ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া দুই হাত বাড়াইয়া যতীশকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পরে বুকের মধ্যেই তার মাথা চাপিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিল। মুখ তুলিয়া যতীশ বলিল,—মণ্টী একলাটি আছে, মাষ্টার মশায়···

মণ্টী! ঐ এক মস্ত শিকল! রঘুনাথ একটু আগে ভাবিতেছিল, তার মাথার উপর হইতে সব দায়িত্বের বোঝা সরিয়াছে, তার সব কাজ শেষ হইয়াছে—এখন সে মুক্ত, স্বাধীন! উদ্দাম গতিতে যেদিকে খুসী ছুটিয়া যাইতে তার আর কোন বাধা নাই! এমনি ছুটিয়া জীবনের একেবারে প্রান্তে,—সে প্রান্ত ছাড়াইয়াও দূরে, আরো দূরে... অবলীলায় নিশ্চিন্ত মনে সে ছুটিয়া যাইতে পারে! পিছনে চাহিবার কিছু নাই, তার প্রয়োজনও নাই! এই সব-হীন শুষ্ক জীবন-প্রান্তরে

প্রাণ ভরিয়া ছুটিয়া সে এই প্রান্তরটা পার হইয়া এখন দেখিতে চায়, সেখানে কি আছে! কিন্তু মন্টী···তাই তো, এ যে মস্ত গোল বাধিল!

পায়ে অমনি শিকল বাজিয়া উঠিল, ঝম্‌ঝম্‌! হায়রে, এমন দুর্দ্দিনেও তাকে মাথা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে—আবার কোন্ সুদিনের আশায় বুক রাঙাইয়া আকুল নেত্রে ভবিষ্যতের পানে চাহিতে হইবে! এ দুর্ভাগ্যের যে আর সীমা নাই।

রঘুনাথ বলিল,—চল, তোমাদের ওখানে যাই।

যতীশ বলিল,—আপনি চলুন। আমি মাকে গাঁ-ময় খুঁজে দেখি। হয়তো আগুন দেখে খুব দূরে কোথাও সরে গেছেন···কিম্বা যদি নদী পেরিয়ে আমাদের ওখানেই গিয়ে থাকেন?

খুব অন্ধকার পথ হাতড়াইয়া পথিক যখন পথ চলিয়াছে, অন্ধের মত, উন্মাদের মত, আশাহীন, উৎসুক দৃষ্টিতে, লক্ষ্যহীন—সে সময় সহসা বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিলে সে যেমন পথটা দেখিয়া তার সন্ধান পায়—তেমনি এই নিবিড় নৈরাশ্যে-ভরা আঁধার পথে এ কথায় যেন বিদ্যুৎ ফুটিল! সঙ্গে সঙ্গে আশার আলোয় ভরা পথের প্রান্তর দেখা গেল—তাহারি একধারে দাঁড়াইয়া ঐ না লক্ষ্মী···!

সকলেই আশার আনন্দে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। তাও তো সম্ভব! সকলে রঘুনাথের পানে চাহিল। রঘুনাথ বলিল,—চল তবে, দেখি।

ছেলের দল রঘুনাথকে লইয়া পার-ঘাটায় চলিল! নদীর জলে দুই-চারিজন লোক স্নান করিতেছিল। কেহ বা স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিতেছে। রঘুনাথের পানে সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। তাদের সে দৃষ্টি বেদনায় মাখা থাকিলেও রঘুনাথের বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মতই

বিঁধিল। বেদনা সহ্য হয়; কিন্তু সে বেদনায় অপরের কৃপা-ভরা দৃষ্টি—সে একেবারেই অসহ্য!

নৌকায় নদী পার হইয়া তীরে নামিতে রঘুনাথের মনেও একবার চকিতে একটু আশার ঝলক বহিয়া গেল। উদ্দেশে ভগবানকে প্রণাম করিয়া মনে মনে সে বলিল, তাই যেন হয় ঠাকুর, লক্ষ্মীকে যেন এখানে দেখতে পাই!

বাড়ীর মধ্যে সকলের আগে গিয়া ঢুকিল, যতীশ। রঘুনাথ স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করিয়া—দুই কাণে সে প্রাণের শক্তি উজাড় করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল—ঘরের কোণে লক্ষ্মীর একটু স্বরও যদি জাগিয়া ওঠে! কিন্তু একটু পরেই যতীশকে নিরাশ-মলিন মুখে ফিরিতে দেখিয়া রঘুনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এত-বড় মূর্খ সে যে এমন আশাও মনে জাগাইতে প্রয়াস পায়!

সমস্ত বাড়ীটা মুহূর্ত্তে তার নিরানন্দ কঠিন জমাট স্তব্ধতা ফুটাইয়া তুলিল। বাপকে দেখিয়া যতীশের মার কোল হইতে মন্টী নামিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল এবং বাপের এমন অস্বাভাবিক মলিন গম্ভীর মুখ আর ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাপের মুখ এমন তো সে কখনো দেখে নাই! রঘুনাথও মন্টীকে সাম্‌নে দেখিয়া এতটুকু হইয়া গেল। কি বলিয়া মন্টীকে সে কি প্রবোধ দিবে! মন্টী যখন বলিবে, বাবা, মার কাছে যাব—তখন সে তাকে কি বলিয়া কোথায় কাহার কাছে লইয়া যাইবে।

বিপদ ঘটিল! মন্টী কথা কহিল, বলিল,—বাবা, মার কাছে যাব।

রঘুনাথের সব ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কোন্ সাগরের অতল জল ঝরঝর করিয়া তার দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। মন্টীও কাঁদিয়া ফেলিল।

যতীশের মা তখন আগাইয়া আসিয়া মন্টীকে কোলে লইলেন ও দুলাইয়া রঘুনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, কেঁদো না। এ কাঁদবার সময় নয়। ধৈর্য্য ধর, এটার পানে চেয়ে বুক বাঁধো। তারপর পুলিশে খপর দাও, খোঁজ কর। মন্টী আমার কাছেই থাকুক। তারপর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—ঘরের মধ্যে বেশ দেখেচো তো? সর্ব্বনাশ হয়ে যায়নি তো? তোমার পিশি?

রঘুনাথ একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না, ঘরে তার কোন চিহ্ন নেই! পিশি ক'দিন এখানে নেই।

—তবে…? যতীশের মা প্রশ্নটা করিয়াই থামিয়া গেলেন। এই 'তবে' কথাটির আর জবাব নাই! তবে…। তবে...কি?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া ঐ 'তবে' কথাটি ইহার মধ্যে এমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে সে ঘূর্ণী বন্ধ করার কোন উপায় নাই, পথ নাই!

তবু চুপ করিয়া শোক বা দুঃখ করিলেও তো চলিবে না! যদি তেমন বিপদেই পড়িয়া থাকে, তবে সেই বিপদেই তাকে ফেলিয়া রাখিয়া এখানে নিশ্চল বসিয়া হা-হুতাশ করিলে কি ফল হইবে? সে বিপদ হইতে তাকে উদ্ধার করা চাই তো! তার উপায়? রঘুনাথ ভাবিল, কি বিপদ? কোথায় গেলেই বা সে বিপদ হইতে উদ্ধারের সন্ধান মেলে!

তবু যাইতেই হইবে! তৃষ্ণায় রঘুনাথের কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল! একগ্লাস জল খাইয়া সে পথে বাহির হইল; মন্টীকে যতীশের মার কাছে রাখিয়া গেল। যতীশের মা বহু কষ্টে বলিলেন,—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও—কিন্তু তার উত্তরে রঘুনাথ এমন মর্ম্মভেদী

কাতর দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া দেখিল যে ও কথার পরে আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

রঘুনাথ চলিয়া যাইতেছিল ; তিনি তার কাছে গিয়া বলিলেন,—মন্টীকে ভুলে থেকো না বাবা। খপর দিয়ো—একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ো না। তোমার মন্টীকে মনে করে ফিরে এসো।

রঘুনাথ বলিতে যাইতেছিল, মন্টীকে তো বেশ নিরাপদ রাখিয়া চলিলাম, তার জন্ম ভাবনা কি! কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না! যতীশের মার এই আকুল প্রাণের এমন খাঁটী দরদ, এই সহানুভূতি,—সে কথায় প্রচণ্ড ঘা খাইবে! সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

— ৮ —

বাড়ীর বাহির হইয়া বহুক্ষণ সে নিরুদ্দেশের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। হঠাৎ মনে হইল, থানা! থানায় যাইতে হইবে! কিন্তু তা হইলে ঐ লোক-জন-ভরা গ্রামের পথ মাড়াইয়া সেই তার চিরসুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ গৃহের সামনে দিয়াই যাইতে হয়। কত লোকের প্রশ্নভরা কৃপাদৃষ্টির ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া যাইতে হইবে! অমনি সে শিহরিয়া উঠিল! পরক্ষণেই মনে হইল, যদি লক্ষ্মী ইহার মধ্যে ঐ কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়া থাকে!···ভগবান কি সত্যই এমন করিবেন! তার প্রাণের এ করুণ আবেদন কি তাঁর প্রাণে পৌঁছায় নাই? তা ছাড়া মন্টী···! ভগবান কি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন?

রঘুনাথ আবার আশা করিয়া নৌকায় উঠিল। পার হইয়া অতি সন্তর্পণে নিজের কুটীরের পানে চাহিল—শূন্য ঘর, শত স্মৃতির জীর্ণ

কঙ্কাল বুকে লইয়া পড়িয়া আছে! শোকের জমাট স্তব্ধতা দগ্ধ গৃহখানার উপর কি করুণ নেত্র মেলিয়া চাহিয়া আছে! তবু রঘুনাথ একবার কম্পিত চরণে ঘরের ভিতর ঢুকিল। উঠানে পোড়া বাঁশ আর খড়ের ছাইয়ে পাহাড় জমিয়া রহিয়াছে! সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—লক্ষ্মী…

নিজের স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। সে স্বরে একটা শৃগাল ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া ধীরে ধীরে গৃহ ত্যাগ করিল। এই গৃহ! যেখানে তার জীবনের যা-কিছু সুখ, যত আনন্দ একেবারে ভরপুর রহিয়াছে, যার স্মৃতি একেবারে হিমালয়ের মত সম্মুখে প্রকাণ্ড পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া দুই চোখের সম্মুখে আড়াল তুলিয়া ধরিয়াছে!

রঘুনাথ পাগলের মত টলিতে টলিতে আসিয়া গ্রামের ফাঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল, কি হইবে এখানে খপর দিয়া! যদি পাইবার হইত, লক্ষ্মীকে এমনিই পাওয়া যাইত! তাছাড়া সুখ তো সে এতদিন অবাধে ভোগ করিয়াছে—অজস্র সুখ! এমন কি ভাগ্য সে করিয়াছে যে এ সুখ আরো বহু বহু কাল ধরিয়া ভোগ করিতে পাইবে! তবু রতীশের মা বলিয়াছে, তাই তাঁর কথা রক্ষা করিবার জন্ম সে ফাঁড়ির মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

একটি বাবু বসিয়া খাতায় কি-সব লিখিতেছিল—পাশে দুইজন জমাদার দাঁড়াইয়া; এমন সময়ে রঘুনাথ তাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাবু মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—কি চাই?

রঘুনাথ বলিল,—আমার ঘরে কাল রাত্রে আগুন লাগে, আর আমার স্ত্রীকেও পাওয়া যাচ্ছে না!

বাবুটি বলিল,—পুড়ে যায়নি তো ?

রঘুনাথ বলিল—না।

বাবুটি রঘুনাথের পানে কৌতূহল-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় গেল তবে ? কার সঙ্গে গেল ?

রঘুনাথ বলিল,—জানি না।

বাবুটি বলিল,—বয়স কত ? নাবালক ?

রঘুনাথ বলিল,—না। একটি মেয়ে আছে—

বাবু হাসিয়া বলিল,—কেমন আগুন হে ? কারো সঙ্গে চলে যায় নি তো ? স্ত্রীটি দেখতে কেমন ?

এই অপমান-স্থচক কথার ভঙ্গীতে রঘুনাথের প্রাণটা ফাটিয়া তীব্র ভৎ'সনা জাগিল। সে কঠোর রুক্ষ দৃষ্টিতে বাবুর পানে চাহিল।

বাবু বলিল,—কাউকে সন্দেহ হয় ? বাবু হাসিল। জমাদার দুইজন পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

রঘুনাথ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কাকেও নয় !

বাবুটি রঘুনাথের পানে চাহিল; পরে বলিল,—বেশ, নালিশ লিখিয়ে যান, তারপর আদালতে গিয়ে দরখাস্ত দিন ! হাকিম হুকুম দেয় যদি তো তদারক করব। বলিয়া সে বহিতে রঘুনাথের নাম-ধাম ও লক্ষ্মীর নাম লিখিয়া লইয়া রঘুনাথকে বলিল,—নাম সই করুন।

রঘুনাথ যন্ত্র-চালিতের মত বাবুটির লেখার পাশে সহি করিল; এবং তার অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া ফাঁড়ি হইতে বাহির হইল। যেদিকে দুই চোখ যায়—সেইদিকে সে চলিবে।

অনেকটা পথ উদভ্রান্তের মত সে বেড়াইল ! বেড়াইতে বেড়াইতে পথ ঘুরিয়া যেখানে আবার নদীর ধারে মিশিয়াছে, সেইখানে

আসিয়া বরাবর সেই ধারে গেল ; জল-হীন দুই তীর—এপারে বাব্‌লা গাছের সার—মাঝে মাঝে ঘোড়া-নিম আর খেজুর গাছ ; ওপারে গাছপালার পর খানিকটা খোলা জায়গা—তারপরই দুইটা তালগাছ। তালগাছের নীচে দু'খানি গোলপাতার ঘর—মাটির দেওয়ালে ঘেরা। ঘরের মধ্য হইতে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। গৃহস্থেরা রান্নাবান্না করিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। হঠাৎ মনে হইল, আজ যদি এমন অসম্ভাবিতভাবে তার সব ওলট-পালট না হইত তো তাহারো ঘরে লক্ষ্মী এখন রান্নাঘরে বসিয়া তাহারি তৃপ্তির জন্য প্রাণের সমস্ত আবেগ লইয়া রন্ধনের কাজে নিজের কমল হাত দুটি ব্যাপৃত রাখিত ! কিন্তু হায়রে, তার সে সব আজ অতীতের স্মৃতির বস্তু !

অতৃপ্ত নেত্রে রঘুনাথ ঐ ঘরের পানে চাহিয়া রহিল—হয়তো ও ঘরে তাহারি লক্ষ্মীর মত ঘরের ঘরণী স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য অন্নপূর্ণার বেশে অন্ন তৈয়ার করিতেছে ! আহা, ওদের সুখ অটুট থাকুক, ওদের হাসি অফুরান হোক…

এমনি সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন কখন্‌ নিজের এই নিরুপায়তা ও অক্ষমতার চিন্তার উপর দিয়া ভাসিয়া দেশের নারীর অবস্থার মধ্যে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, এই বাঙলা দেশের নারী কতখানি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারীর মতই জীবনের পথে চলিয়াছে ! স্বামীর জন্য রান্নাবান্না করিয়া, তার পদ-সেবায় সমস্ত মন নিঃশেষে ঢালিয়া এক কোণে পড়িয়া আছে ! এত বড় জগতের কোথায় কি আছে, কি বিপদ, কি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সে চিন্তা তার মনের কোণেও ঠাঁই পায় না। তা যদি পাইত, তাহা হইলে এমন

করিয়া প্রাণহীন তৈজস পত্রের মতই তার লক্ষ্মীকে কখনো কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে! লক্ষ্মী সে বিপদের মুখে এমন তেজে দাঁড়াইয়া উঠিত যে প্রবলেরও সাহস হইত না তার কাছে ঘেঁষিতে! দুর্ব্বল হইলেও ভিতরকার সে শক্তি দেখিয়া প্রবল দস্যু-তস্করও কতক কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত! অন্ততঃ বুদ্ধিটাও তার বাহিরের আব-হাওয়ায় এমন পাকিতে পারিত যে দুইটা কৌশলে বা তর্জ্জনে হুঙ্কারে সে দস্যুকে হঠাইতে পারে! এই যে তস্করের দল ঘটী-বাটীর মত একজন নারীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এ বুঝি এই বাঙলা দেশেই শুধু সম্ভব! কেন এমন হয়? এ সাহস, এ মন দুর্ব্বৃত্ত কেমন করিয়া পায়? সে জানে, পাঁচিলে ঘেরা নারী, ঘোম্‌টায় ঢাকা নারী—স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও যে সরমে নত হইয়া পড়ে—বাহিরের লোকের একটা তীব্র দৃষ্টির সামনে দাঁড়ানো দূরের কথা—সে দৃষ্টির পরশকে সে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতই ভয় করে,—দুর্ব্বৃত্তও তাই সাহস পাইয়া ভাবে যে এই নারী তার সবল হাতের গ্রাস ছিনাইবার কথা মনেও করিবে না—লজ্জাবতী লতার মত নির্জ্জীব কুণ্ঠিত মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা দিবে! একটা জীবন্ত জীব—তাও অবোলা পশু নয়- তাকে কি মাটীর ঢেলার মতই বাঙালী তার সংসারে পাঁচিলের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অবোলা পশুও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত-পা ছুড়িয়া, সে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে! আর বাঙালীর মেয়ে—কি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারী সে!

ভাবিতে ভাবিতে রঘুনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই যে খবরের কাগজে নারী-নিগ্রহের এত সংবাদ দিকে দিকে ঘোষিত

হইতেছে, এর জন্ত বাঙালীর চরিত্র-হীনতা, বাঙালীর অপদার্থতার চেয়ে নারীকে অবহেলা, অবজ্ঞা, মানুষ বলিয়া মনে না করা আর তাকে খেলার পুতুল করিয়া রাখাই তো বেশী দায়ী! ট্রেণে চড়িয়া ইংরাজ-নারী এই যে একা কোথা হইতে কত দূরে চলিয়াছে—দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, পথে ঘাটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে—তাকে ধরিতে কোনো পরাক্রান্ত দস্যুর হাতও ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। আর বাঙালীর মেয়ের উপর এ আক্রমণ, এ যে নিত্যকার ব্যাপার হইতে চলিয়াছে!...

রঘুনাথ তপ্ত চিত্তে জলের পানে চাহিল। তার সমস্ত বুক জুড়িয়া কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, বুক এমনি তাতিয়াছিল! সে ধীরে ধীরে জলে নামিল; প্রায় বুক-ভোর জলে গিয়া কতকগুলা ডুব দিল। তারপর ক্ষণেক স্তব্ধ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, এই জীবনটাকে জগতের পথে টানিয়া চলিয়া আর কি হইবে! এই শান্ত শীতল জলের কোলে সব জ্বালা জুড়াইতে দিলে মন্দ হয় না তো! এক-পা এক-পা করিয়া সে জলের কোলে আরো অগ্রসর হইল—চোখের সামনে এক অজানা লোকের ছবি জাগিয়া উঠিল—ঐখানে ঐ-লোকে হয়তো লক্ষ্মী ইহার মধ্যে আসিয়া তাহারি জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছে! সে আর-একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল! মনে হইল, একটু চাহিয়া থাকিলেই লক্ষ্মীকে বুঝি দেখিতে পাইবে! এমন সময় হঠাৎ একটা স্বর তার কাণে আসিয়া বাজিল,—মা...

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল—এ তার মন্টার স্বর, না? তবে কি লক্ষ্মী আসিয়াছে? আসিয়া রঘুনাথকে ঘরে না দেখিয়া মন্টাকে সঙ্গে লইয়া তাহারি সন্ধানে পথে বাহির হইয়াছে! দুই চোখের

উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সে তীরের পানে চাহিল। ওপারে ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক নারী কলসী কক্ষে নদীর জলে নামিয়াছে, আর তীরে দাঁড়াইয়া তার ছোট মেয়েটি তাকে ডাকিতেছে! মেয়েটি...এ যেন তার মন্টীর ছায়া! রঘুনাথ অপলক নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। কি শান্ত মধুর ছবি ঐ জলের কোলে ফুটিয়াছে, মরি!

রমণী জল লইয়া চলিয়া গেল; বালিকা তার অনুসরণ করিল। তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে গেলে রঘুনাথ সহসা শিহরিয়া উঠিল। তাই তো, মন্টী—তাকে ফেলিয়া সে মরিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিয়াছে! তার মন্টী মা-হারা বাপ-হারা কোথায় দাঁড়াইবে! কার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে সে! না, মরা তো হয় না! রঘুনাথ জল হইতে উঠিয়া পাগলের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তারপর যে পথে আসিয়াছিল, আবার সেই পথে চলিল।

বহুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ সে দেখিল, এ যে তার সেই গৃহের দ্বার, সেই পথ, সেই বাগান, সেই সব! দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া সে ঘরের পানে চাহিয়া রহিল। ঘরের সম্মুখে ভস্মস্তূপ বিশৃঙ্খল ছড়ানো, পোড়া বাঁশ, কাঠ, ইট। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী...

কোন উত্তর নাই। তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রঘুনাথ বাড়ী হইতে বাহিরে আসিল। তারপর মাতালের মত পা দুইটাকে টানিয়া পারঘাটায় আসিয়া একটা নৌকায় উঠিয়া বসিল, বসিয়া ওপারের দিকে ইঙ্গিত করিল। মাঝি নৌকা খুলিয়া তাহাকে লইয়া ওপারে পৌঁছাইয়া দিতে রঘুনাথ নামিয়া যতীশদের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

যতীশের মা তখন সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতেছেন, যতীশ মন্টীকে লইয়া গল্প বলিতেছিল। এই শান্তির মধ্যে রঘুনাথ একটা অভিশাপের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গল্প থামাইয়া যতীশ তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মন্টী ঝাঁপ দিয়া কোলে পড়িল। রঘুনাথ পাগলের মত দৃষ্টি মেলিয়া মন্টীর পানে চাহিয়া দেখিল।

যতীশের মা আসিয়া বলিলেন,—পেলে বাবা ?

উদাসভাবে ঘাড় নাড়িয়া রঘুনাথ জানাইল, না।

— ৯ —

লক্ষ্মীকে লইয়া মোটর তীরের মত ছুটিল বড় রাস্তা ধরিয়া, সোজা —রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া, ঘুমন্ত প্রকৃতির বুক চিরিয়া! এই আকস্মিক বিপদে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় সংগ্রাম করিয়া লক্ষ্মী কেমন আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভোরের পূর্ব্বক্ষণে গাড়ী একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। সেই গলিতে খানিকটা পথ চলিয়া এক জীর্ণ বাগান— আলকাৎরা-মাখা কালো কাঠের ভাঙ্গা কঠক। গাড়ী সেই বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার ফটক খুলিয়া ভিতরে গাড়ী লইয়া গেল। ভিতরে দোতলা বাড়ী; জীর্ণ। তার সামনে গাড়ী থামাইয়া ড্রাইভার লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দেখে, লক্ষ্মীর তখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই।

ড্রাইভার মূর্চ্ছিতা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ভাবিল, রূপের জ্যোৎস্নাই বটে! কিন্তু কি মেঘ এ জ্যোৎস্নায় কালির রেখা টানিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ড্রাইভার লক্ষ্মীকে কোলে করিয়া লইয়া দোতলায় উঠিল। দোতলায় চারধারে বারান্দা—

বারান্দার কোলে ঘর—সেই ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে একটা জীর্ণ কৌচের উপর শোয়াইয়া ঘরের সম্মুখে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে সে নীচে নামিয়া আসিল; তারপর গাড়ীতে গিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সে আর কি করিবে? হুকুমের চাকর বৈ তো নয়।

লক্ষ্মীর যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন একটা জানলার ফাঁক দিয়া এক-ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে! লক্ষ্মী প্রথমটা কেমন আচ্ছন্নের মত ছিল। হঠাৎ সে ভাব কাটিলে উঠিয়া জানলার ধারে গেল। নীচে জঙ্গল, এককালে বাগান ছিল; এখন অযত্নে আগাছায় ভরিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে! সে কিছুক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল—বাহির হইতে দ্বার তালা বন্ধ। তার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল, মাথা ঝিম্‌ঝিম করিতে লাগিল। ক্রমে আগাগোড়া ব্যাপারটা আগুনের হল্‌কার মত সমস্ত মনের মধ্যে ফুটিবামাত্র সে আতঙ্কে শিহরিয়া মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মেঝেয় কোন্ পুরাকালে একটা মোটা কার্পেট বিছানো হইয়াছিল; অযত্নে আজ সেটা ধূলায় ঢাকা, মাঝে মাঝে ছেঁড়া।

মূর্চ্ছার ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল, ঘরে স্বামীর পাশে শুইয়া আছে, বুকের কাছে আছে মন্টী! স্বামী ঘুমাইতেছেন, মন্টীও ঘুমে অচেতন। জাগিয়া মাথার মধ্যে কত কি যে কুণ্ডলী পাকাইতেছিল, কত সুখ, কত বেদনা, কত আশা, কত ভয়, সে যেন হরেক রঙের ফুলঝুরি ফুটিতেছিল! হঠাৎ কি একটা শব্দ হইল,—তার মাথার মধ্যকার যত রঙের ফুল ঝড়ের মুখে পাপড়ির মত অমনি ঝরিয়া পড়িল। সে দেখে, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দৈত্য

দুই চোখে আগুন জলিয়া তার পানেই ছুটিয়া আসিতেছে! ভয়ে সে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, মন্টাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া লুকাইল। তবু দৈত্য ছাড়িল না; স্বামীর বুক হইতে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে বাতাসের মুখে উড়াইয়া লইয়া চলিল! হাত-পা ছুড়িয়া ভীষণ সংগ্রাম বাধাইয়া সে এমন বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটাইল যে হঠাৎ দৈত্যের হাত ছাড়াইয়া আসিয়া পড়িল নীচে এক পাহাড়ের গায়ে! অমনি পাথরে মাথা ঠুকিয়া গেল। একটা চীৎকার করিয়া সে চোখ মেলিল—আঃ… ! স্বপ্ন! কিন্তু এ কি, অজানা ঘর, অজানা ঠাঁই! কোথায় ঘর—কোথায় স্বামী? এ যে সে স্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠোর নির্ম্মম সত্য! অমনি সব কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই গাছের ছায়ায় ছায়া-করা গ্রামের পথ—দস্যুর কোলে বন্দী সে, নিষ্কৃতি-লাভের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়াও হার মানিয়াছে—তারপর সব ঝাপসা—আঁধারে ভরিয়া গেল! মাঝে মাঝে চমক ফুটিতেছিল। মোটর গাড়ী, তাহাতে শুইয়া সে—মুখে কাপড় বাঁধা, মাথার উপর চাঁদের আলোয়-ভরা আকাশ সরিয়া সরিয়া পিছনে চলিয়াছে! আকাশের এমন ছুটাছুটি সে আর কখনো দেখে নাই। তার পর মনে পড়িল, সে ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, হঠাৎ আগুন লাগিল! তারপর…? ভয়ে তার সমস্ত শরীর চমকিয়া উঠিল। এ আর স্বপ্ন নয়, ভয় নয়—বিপদ যা ঘটিবার, তা ঘটিয়া গিয়াছে! হায়রে, কোথায় তারা—এখন কি করিতেছে! তাকে না দেখিয়া কি ভাবিতেছে! কি করিয়া সন্ধান লইয়া এখানে আসিবে? প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না, তাই বা কে বলিয়া দিবে!…

তার চোখের সামনে দিনের আলো, সূর্য্যের ঐ রশ্মিচ্ছটা চকিতে ঘোলাটে হইয়া নিবিয়া আসিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে

শুইয়া পড়িল। দুই চোখে অমনি রাজ্যের ঘুম আসিয়া বাসা বাঁধিল।

তারপর বহুক্ষণ এমনি পড়িয়া থাকার পর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে দেখে, সাম্‌নে কাঁচের বাসনে রাশীকৃত ফল, আর লুচি তরকারী সাজানো রহিয়াছে। দেখিয়া ঘৃণায় তার মন ভরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সেগুলার পানে তাকাইয়া থাকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে জানলায় আসিয়া বসিল। জানালার নীচেই আগাছার ঘন ঝোপ, মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না। চারিধার স্তব্ধ। বহুদূর হইতে একটা কুকুরের চীৎকার সে স্তব্ধতার গায়ে আঘাত করিয়া স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে! সে দুই চোখ মেলিয়া উদাস মনে নীচের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঐ যে বহুদূরে ঝোপের ফাঁক দিয়া একটু জল দেখা যাইতেছে—বুঝি, একটা পুকুর ওখানে আছে। তারপর খুব দূর একটা স্বরও ঐ ভাসিয়া উঠিল—কে নাম ধরিয়া কাহাকে ডাকিতেছে না? স্বরটা শুধুই প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলিল, তারপর আবার সব স্তব্ধ! লক্ষ্মী ভাবিল, জায়গাটা তবে একেবারেই জন-মানবশূন্য নয়!...

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার তরঙ্গ ছুটিল, চারিদিককার বিরাট শূন্যতার উপর ভর করিয়া, তাহারি বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া...কোথায় কোন্ অজানা কূল লক্ষ্য করিয়া! কিন্তু ঘুরিয়া কোথাও কূল না পাইয়া শ্রান্ত হইয়া আবার বুকের মাঝে নিরাপদ নিশ্চিন্ত বাসা বাঁধিবার জন্য ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী ভাবিল, হায়রে, কোথায় কে মানুষ আছে—যে তাহাকে এ কারাগার হইতে মুক্ত করিবে! বেচারা স্বামীর করুণ কাতর মুখও মনের কোণে ফুটিয়া উঠিল,—পাশে মন্টী, কাঁদিয়া শ্রান্ত আকুল নেত্রে স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে!

আকাশের গায়ে বহু উর্দ্ধে কয়টা পাখী উড়িতে ছিল—লক্ষ্মী ভাবিল, মানুষ না হইয়া যদি সে পাখী হইত! কি সুখী ঐ আকাশের পাখী! মুক্ত আকাশে কত উপরে খুসী হইলেই উঠিতে পারে—ওখান হইতে নীচে পৃথিবীর বুকে যেখানে যা আছে, সব চোখে পড়িতেছে! এমন করিয়া শূন্যতা ভেদ করিয়া চিন্তার তরঙ্গে মন ভাসাইয়া উহাদের দুরাশার স্বপ্ন বুনিতে হয় না! সে যদি মানুষ না হইয়া অমনি পাখী হইত!

কিন্তু না, পাখী হইলে স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালবাসা—এ সব কি এমনি করিয়াই তার অদৃষ্টে ঘটিত! তার চেয়ে এখন সে পাখী হইতে পারিত যদি! পাখী হইলে এই জানলার ফাঁক দিয়া অনায়াসে এক নিমেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া ঐ আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইত—কত বন, কত পথ, কত মাঠ পার হইয়া সেই ঘরখানিতে গিয়া একেবারে রঘুনাথের বুকের পাশে ধরা দিয়া বলিত, আমি এসেচি! হায়রে, এই পাখী হওয়ার বিদ্যাটা যদি তার জানা থাকিত! ঠাকুর, একবার আসিয়া তাকে মানুষ হইতে পাখী করিয়া দাও! না হয় আর মানুষ করিয়ো না—স্বামীর প্রেম না পায়, তাও সে সহিতে রাজী আছে,—তবু তাঁর কাছে কাছে সে থাকিতে পারিবে তো!

এমনি যা-তা ভাবিয়া ভাবনার পুঁজি ফুরাইয়া আসিলে সে একেবারে কাতর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুকের মধ্যে অমনি কি একটা বেদনা এমন ঠেলিয়া আসিল যে তার চাপে নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যায়! সে ভাবিল, মরণ, সে তো হাতেই আছে! ভাবিয়া কূল যখন পাওয়াই গেল না, তখন মিছা আর কেন ভাবা! তার চেয়ে···

সে আঁচলটা টানিয়া বিছাইয়া ধরিল। এই তো মরণের ইঙ্গিত! আর কেন? আঁচলটা সে গলায় জড়াইল—তারপর একটা ফাঁস টানিল। ফাঁসটা গলায় আঁটিতেই চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, রঘুনাথের কাতর দুই চোখ, মন্টির অশ্রু-ভরা ছোট্ট মুখ! লক্ষ্মীর হাত কাঁপিল—না, মরা হইবে না—তা হইলে তাদের সব আশা একেবারে যে নির্ম্মূল করিয়া দিবে! তারা হয়তো এখনো আশা করিতেছে, লক্ষ্মী ফিরিবে! তার খোঁজ করিতেছে চারিধারে, কি ব্যাকুল আবেগে! আর সে...?

ফাঁস খুলিয়া অবসন্নের মত সে বসিয়া পড়িল, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। আঁচল বিছাইয়া ধীরে ধীরে সে শুইয়া পড়িল—চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিল।

— ১০ —

এই ঘুম আর জাগা, তার ফাঁকে ফাঁকে চিন্তার জাল বোনা—লক্ষ্মী ভাবিল, সে কি পাগল হইবে!

তখন বাহিরে দিনের আলোর উপর সন্ধ্যার আঁচল লুটাইয়া পড়িয়াছে—চারিধার আঁধারে ভরিয়া আসিতেছে। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ঝোপ-ঝাপ, ঐ গাছ-পালা—উহার মধ্য হইতে আলোটুকুকে হঠাইয়া আঁধার আসিয়া তার জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে! বনের বুক চিরিয়া ঝিল্লীর রাগিণী উঠিতেছে—ওরা কি বলে, ও কি গান গায়! ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্...ও স্বরে মন ভয়ে ভরিয়া ওঠে যে! এতক্ষণ আলোর মাঝে লক্ষ্মী যে তাকে নির্ভর করিয়াই অজানা পথে-ঘাটে ঘুরিতে ফিরিতে পারিয়াছিল—এ

আঁধারে পা তো চলে না! লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া জানলায় বসিয়া রহিল।

বাহিরে দ্বারে শব্দ হইল—কে তালা খুলিতেছে! তার দুই চোখ জলিয়া উঠিল—অধীরতায় মন যেন ফুঁসিতেছিল! কে জানে, এ দৈত্যপুরীর মাঝে হয়তো কে মানুষ আছে, যে আসিয়া বলিবে, লক্ষ্মী, তুমি মুক্ত। না! এ হয়তো দৈত্যের প্রহরী মমতায় গলিয়া তাহাকে আসিয়া বলিবে, যাও লক্ষ্মী, দ্বার খোলা—পলাও তুমি!...না, এ দৈত্য নিজে, কোনো উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আসিতেছে! উঠিয়া নিজেকে সম্বৃত করিয়া সে একেবারে তৈয়ার হইয়া বসিল। যদি উপদ্রব আসে তবে যে-শক্তিটুকু তার এখনো বাকী আছে, সেটুকু লইয়াই একবার প্রাণপণে লড়িবে! প্রাণটাকে ছেঁচিয়া হত্যা করিয়াও সে একবার জীবন-পণ লড়িয়া দেখিবে। তার দুই চোখ হইতে যেন আগুনের শিখা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ফুঁসিতেছিল।

দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে আসিল একটা মালী, হাতে তার আলো। সেই আলোয় মালীর মুখখানা এমন ভীষণ দেখাইল যে ভয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজিল। তার পর চোখ খুলিয়া সে দেখে, মালী আলো রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল—ওগো, আমায় ছেড়ে দাও গো, বাঁচাও তুমি!

মালী তার পানে ফিরিয়া চাহিল। লক্ষ্মীও ঘাড় তুলিয়া তার পানে চাহিল—কি করুণ কাতর সে দৃষ্টি। মালী তার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল—তার চোখে নিরুপায়তার ম্লান দৃষ্টি!

লক্ষ্মী বলিল,—আমায় ছেড়ে দাও—ঘরে আমার মেয়ে, আমার স্বামী ভেবে মরে যাচ্ছে!

মালী কথা না কহিয়া পা ছাড়াইয়া লইল, তারপর লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

দ্বারে তালা লাগানোর শব্দে লক্ষ্মীর হুঁস হইল। সে উঠিয়া দ্বার নাড়িল। দ্বার তখন বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী ভাবিল, হায়রে, কেন সে ঐ খোলা দ্বার-পথে পলাইবার চেষ্টাও একবার করিল না! দ্বার ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর ভারী পা দুইটাকে টানিয়া আবার মেঝেয় আসিয়া বসিল! উপায় নাই, আর উপায় নাই! শেষ যে সুযোগটুকু মিলিয়াছিল, তাও সে এক দুর্ব্বল অন্ধ মুহূর্ত্তে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছে!

অনেক রাত্রে আবার দ্বার-খোলার শব্দ হইল। লক্ষ্মী ভাবিল, এবার সে চেষ্টা করিবেই···দ্বারের পাশে সে রুখিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যটা এমন সজোরে দুলিতেছিল যে তার ধক্-ধক্ শব্দ তার কাণে বাজের মত বাজিতেছিল।

দ্বার খুলিতেই যে-মূর্ত্তি সে চোখে দেখিল, তাহাতে তার হাত-পা অবশ হইয়া গেল, সমস্ত শক্তি চকিতে উবিয়া গেল। সে কেমন বিহ্বলের মত হঠিয়া সরিয়া আসিল। এ সে! মোটরে তাকে যে তুলিয়া দিয়াছিল—মুখে বিশ্রী হাসি! এ সে, যাকে পুকুর-ধারে গাছের আড়ালে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!

যে আসিয়াছিল, সে রজনী! রজনী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—আমায় মাপ করো।···কেমন আছ?

লক্ষ্মী ভয়ার্ত্ত চোখে রজনীর পানে চাহিল—চাহিতেই তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে চোখ বুজিল।

রজনী কৌচে বসিয়া ডাকিল—প্রেয়সী···

কি বিশ্রী সে আহ্বান—কুৎসিত, বিকট !...লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া আবার চাহিল। রজনী পকেট হইতে একটা কালো রঙের ছোট বাক্স বাহির করিয়া খুলিল ; খুলিয়া বলিল,—এই ছাখো......

লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না, চাহিয়া দেখিল, কালো বাক্সের মধ্য হইতে আগুনের মত কি একটা দপ্ দপ্ করিয়া জলিতেছে !

চুনি-হীরা-পান্না জড়ানো একছড়া হার বাক্স হইতে বাহির করিয়া রজনী হাসিয়া বলিল,—তোমার রূপের পূজায় আমার এই পাদ্য-অর্ঘ্য নাও তুমি।

বলিয়া সে উঠিয়া হার ছড়া লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিতে গেল। লক্ষ্মী জড়-সড় হইয়া নিজেকে আঁটিয়া এমনভাবে বসিল, যেন সে পাথরের মূর্ত্তি ! চেতনা কিছু মাত্র নাই।

তার সে আড়ষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া রজনী বলিল,—তোমায় রাণী করে রাখবো। এত রূপ নিয়ে তুমি পুকুর-ঘাটে এক ভিখিরীর এঁটো বাসন মেজে দিন কাটাবে,—তাও কি হয় ? আমার যে তাতে বুকে বাজে ! আমার এই বুকের মাঝে সিংহাসন পেতে তোমায় তাতে বসিয়ে রাখবো—দিন-রাত।...মুখ তোলো, চেয়ে ছাখো, প্রেয়সী !...তোমায় প্রেয়সী বলেই ডাকবো আমি,—ঐ একটি নামই তোমায় সাজে, শুধু !

লক্ষ্মী সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল—এ কি, এ যে সত্যই একটা লোক আসিয়া এমনি সব অদ্ভুত কথা তাহাকে ডাকিয়া অনায়াসে শুনাইতেছে ! এও কি সম্ভব !—না, সে এ একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে ! লক্ষ্মী কিছুই বুঝিতে পারিল না। তার দেহ, তার মন যেন একটা হাল্কা সূতার ভরে হাওয়ায় দুলিতেছিল—পায়ের নীচে কোন অবলম্বন নাই, ভুঁই নাই, কিছুই নাই।

হঠাৎ একটা অসহ্য স্পর্শে তার মন সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভালো করিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি, এ কার দুই হাতের বাঁধন তার অঙ্গে এমন আঁটিয়া বসিয়াছে!...অত্যন্ত নোংরা জিনিষের মতই সে হাত দুইটাকে সে ঠেলিয়া ছাড়াইতে গেল! লোহার শিকলের মত শক্ত বাঁধন—তাও খুলিল। রজনী তখনি দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—আমার হাতের বাঁধন কেটে কোথায় যাবে প্রেয়সী?

লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া এক কোণে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রজনীও বিহ্বলভাবে তার পিছনে চলিল। লক্ষ্মী আর-এক কোণে সরিয়া গেল, তারপর আর-এক কোণ—যেখানে যায়, সেখানেই ঐ হাত দুইটা তার পিছনে! উপায় নাই! মাগো—বলিয়া লক্ষ্মী মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে লক্ষ্মী দেখে, সে রজনীর কোলে মাথা দিয়া শুইয়া আছে। একবার মনে হইল, এ তার সেই ঘর—আর সেই ঘরে রঘুনাথের কোলেই মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে! রঘুনাথ কখন্ আসিল? তার যে এখনো কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নাই! পা ধুইবার জল? ধড়মড়িয়া লক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই চোখ পড়িল এই কারাগারের বদ্ধ প্রাচীরে। না, এ সেই অজানা ঘর—অমনি দৃষ্টি পড়িল রজনীর দিকে—এ তো স্বপ্ন নয়, ঐ যে সে দুর্বৃত্ত...উঃ!

লক্ষ্মী অসহায়, একান্ত নিরুপায়! কি করিবে, সে কি করিবে?

হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা তার মনের আঁধার চিরিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে একেবারে রজনীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল,—আমায় ছেড়ে দিন্, দয়া করে ছেড়ে দিন্!

রজনী দুই হাতে পায়ের উপর হইতে লক্ষ্মীকে সরাইয়া দিল, দিয়া বলিল,—তোমায় ছাড়ার জন্যেই কি এত আয়োজন করেছি, প্রেয়সী! তোমায় ছাড়তে গেলে প্রাণটাকেও ছাড়তে হয় যে! তোমায় ছাড়বো না তো! তুমি যে আমার মাথার মণি—

বলিয়া রজনী আবার লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য দুই হাত বাড়াইল। লক্ষ্মী তার হাত দুইটাকে ঠেলিয়া সরিয়া গেল, অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—আপনি আমার বাপ...আমি মেয়ে...

এ কথার উত্তরে রজনী এমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল যে তার শব্দে চারিধার কাঁপিয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, এই ঘরটাও বুঝি ও-শব্দে এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

লক্ষ্মীর আর কিছু বলিবার নাই। নারীর এ কাতরতায় যে-পুরুষ এমন পরিহাসের হাসি হাসিতে পারে, তার কাছেও সে মুক্তির আশা রাখে? নিজের উপর রাগ ধরিল। কিছুক্ষণ পূর্বে এই যে তার মরিবার সাধ হইয়াছিল, কেন সে তখন মরিল না? এই দুর্বৃত্তের হাতে পড়িয়া এমন লাঞ্ছনা তো তাহা হইলে সহিতে হইত না।

রজনী বলিল,—শোনো প্রেয়সী, তোমার সোনার অঙ্গে কঠিন হাত দেব, এত বড় বর্ব্বর আমি নই। আমি রূপের পূজারী। এ রূপ আমি বুকে ধরে পূজা করবো, তাই তোমায় এনেছি। আজ না হয়, কাল; কাল না হয়, পরশু—তোমায় একদিন আমি পাবোই। তবে জোর করে পাওয়া নয়...তাতে সুখ নেই।

লক্ষ্মী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রজনীর পানে চাহিয়া রহিল।

রজনী আবার বলিল,—এই যে হার দেখচো, এ কিছুই নয়—তোমার ঐ সোনার অঙ্গ এমনি হারে ভরিয়ে দেব। আমার যা-কিছু আছে

সব তোমার পায়ে সঁপে দেবো—সর্ব্বস্ব তোমায় দেবো। তোমার স্বামী, তোমার মেয়ে—তাদেরও খুব সুখে রাখবো—শুধু তুমি আমার হও!

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া রজনী আবার বলিল,—তুমি ভেবে ভাখো প্রেয়সী, তোমার এ রূপ, এ যৌবন নিয়ে, তুমি সর্ব্বময়ী হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমার কথায় আমি উঠবো বসবো। আজ আমি যাচ্ছি…তোমায় জ্বালাতন করবো না…আজ প্রথম দিন। অসময়ে এসেচি…জানি, ভয়ে তোমার মন এখন ভরে আছে। কিন্তু ভয় নেই…তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হাত দেবো না। তবে সময় দিলুম।—তুমিও ভেবে দেখো…যদি একান্ত না পাই তোমায়, তা হলে—

রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিল,—তারপর আবার বলিল,—যেখান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো।

লক্ষ্মী কাঠ হইয়া সব কথা শুনিল। কথাগুলা যেন হাওয়ায় ঘুরিয়া কোন্ সুদূর কোণ হইতে ভাসিয়া তার কাণে আসিয়া লাগিতেছে! ঐ শেষের দিকের কথাটা—যেখান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো—এ কি হইবে? ভগবান, ভগবান…এ কি সে সত্যই শুনিয়াছে, না, এ স্বপ্নের আর এক ছলনা!

রজনী বলিল,—তোমায় আর বিরক্ত করবো না। চললুম। তুমি ভেবে দেখো সব। আমার এ ভালবাসা তুমি পায়ে ঠেলো না। আমি তোমার ভালোবাসার ভিখারী—বলিয়া রজনী লক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তার মুখের দিকে আকুল চোখে চাহিল। লক্ষ্মী তবু অসাড়, মূক, নিস্পন্দ। রজনী বলিল,—কি পাষাণ তুমি, প্রেয়সী। আচ্ছা, দেখি, আমার বুক-ফাটা চোখের জলে ও

পাষাণ গলে কি না একদিন! আজ পর্য্যন্ত কখনো আমি ভালবাসা ভিক্ষা চেয়ে নিরাশ হইনি…!

রজনী উঠিয়া কৌচে বসিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া তেমনি নিঝুম দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ এমনি থাকিয়া রজনী উঠিল, বলিল, —আমি চললুম। মোদ্দা আমার কথাটা তুমি ভেবো প্রেয়সী। এতখানি ভালোবাসা কি মিছে হবে!—আর খাওনি-দাওনি কেন? ছি, ওতে শরীর থাকবে কেন!

কথাটা বলিয়া রজনী ঘুরিয়া দ্বারের কাছে গেল; তারপর আর একবার লক্ষ্মীর পানে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল। দ্বারে তালা পড়িল এবং লক্ষ্মী যে বন্দী সেই বন্দীই রহিল।

রজনী চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আবার সেই জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। এইমাত্র যে সব কুৎসিত কথা শুনিয়াছে, তার দূষিত বাষ্পে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। নীচে তখন গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই ঘন ঘোর আঁধারে জোনাকির ঝিকিমিকি—তার আঁধার ভবিষ্যতের পথে যেন একটু আলোর রশ্মি…উঁকি দিতেছে! সে ভাবিল, সে মরিবে না। এখানে এই পরের ঘরে পরের আশ্রয়ে এমন ভাবে মরার কথা মনে হইলে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ওঠে! মরিতে যদি হয় তো সেই তার শত সুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ ঘরের মাঝে গিয়া মরিবে! স্বামীর সামনে নাও যদি মরিতে পায়, তবু সেই ঘরেই তার মরণ-শয্যা বিছানো চাই! তাঁর পায়ের ধূলায় ভরা ঘর, তাঁর হাসিতে, তাঁর প্রেমের আলোয় আলো-করা ঘর—মরিবার মত অমন ঠাঁই এ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে!

কিন্তু সব দ্বার যে বন্ধ! সে কেমন করিয়া এ বাঁধন কাটিয়া বাহির

হইবে! এ সে কত দূরে কোন্ দেশে আসিয়া পড়িয়াছে—কোন্ পথ ধরিয়াই বা যাইবে! সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কোন দিশাই যখন পাওয়া গেল না, তখন এ বিপদের মধ্যেও তার হাসি আসিল। এই ছোট ঘরখানার ভিতর হইতে সে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না,—ইহার মধ্যে সে বাহিরের পথের কথা ভাবিয়া আকুল! হায়রে,অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনায় কি কোন মানুষ পড়িয়াছে কোন দিন!

— ১১ —

সেদিন সারা রাত্রি ভাবিয়া রঘুনাথ স্থির করিল, লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া সে বাহির করিবেই। এই তার পণ! এই পণ লইয়াই সে বাড়ীর বাহির হইবে! তার প্রাণের লক্ষ্মী···তার উপর মস্ত নির্ভর রাখিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত মন লইয়া ঘরের কোণে বসিয়াছিল—নিজেকে রক্ষার কোন উপায় যে কোনদিন তার সেবার মধ্যে মনে করিবারও সময় পায় নাই...সেই লক্ষ্মীকে এমন বিপদে ফেলিয়া সে চুপ করিয়া থাকিবে,—মরিয়া দায়িত্বের হাত এড়াইবে? এ বিষম স্বার্থ-চিন্তাও যে ক্ষণেকের জন্ত তার মনে জাগিয়াছিল, সে জন্ত নিজের উপর রাগ হইল। এই তার ভালবাসা, এই তার স্বামিত্ব! আদায় করিবার বেলা ষোল-আনা, দিবার বেলা কিছু না! তা হইতেই পারে না!

কিন্তু মন্টী? মন্টীকে লইয়া কি করা যায়! ইহাদের বাড়ী ফেলিয়া গেলে দেখাশুনার বা যত্নের ত্রুটি হইবে না—কিন্তু তার আত্মার আছে, বাসনা আছে। বিশেষ মা-বাপ দুইজনকে চোখের আড় করিয়া তার মন যখন ছুইয়া পড়িবে! তাছাড়া অসুখ-বিসুখ হইলে···এতখানি দায়িত্ব কি ইহাদের ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে? বলিলে ইহারা রাজী

হইবেন নিশ্চয়—কিন্তু ভাল লোক বলিয়াই কি তাঁদের ঘরের উপর এতখানি ভার চাপাইয়া সে বেশ হাল্‌কা হইয়া বাহির হইবে ? যদি লক্ষ্মী বলে, ওগো, তাকে কেমন করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ ! আমি যে তাকে তোমার কাছে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত আছি···

রঘুনাথের মন বলিয়া উঠিল, না, না, মণ্টীকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। এতখানি বেদনা সহিয়া যাইতেছে, আর একটা ছোট মেয়ের ভার,—এ আর সহা যাইবে না ? তা-ছাড়া নৈরাশ্যের মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল মন যখন অবলম্বন না পাইয়া দিখিদিকে ছুটিতে চাহিবে, মরণের কোল খুঁজিবে, তখন মণ্টী পাশে থাকিলে অনেকখানি শক্তি মিলিবে, সাহসও···! তাছাড়া আশাও একেবারে তাবা হইলে আর মন হইতে সরিয়া যাইবে না। মণ্টীকে সঙ্গে লইয়াই নূতন পথে চলিতে হইবে !

কিন্তু কোথায় খোঁজ করা যায়—কোন দিকে, কোন পথে ! মানুষ এমন নিশ্চিহ্ন হইয়াও উবিয়া যাইতে পারে যে একটা লোক সন্ধান দিতে পারে না ?

হঠাৎ মনে হইল, সেই যে ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়াছিল, তাকে মোটরে দেখিয়াছি।...কার মোটর ? মোটরে সে গেল কি করিয়া ? তবে—তবে কি···কোন দুর্ব্বৃত্ত তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে !

ভাবিতে ভাবিতে পুরাকালের সেই মর্ম্মভেদী কাহিনী তার মনে পড়িল। বনের মধ্যে বাকল-পরা রাজার ছেলে পাতার কুঁড়েয় আশ্রয় লইয়াছিলেন, দুঃখের আর সীমা ছিল না। সেই বন-মধ্যে একমাত্র অবলম্বন সীতাদেবীকে হারাইয়া তিনি রাজার ছেলে ত্রি-ভুবনের মালিক হইয়াও ধৈর্য্য হারান নাই। সেই সীতাকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প লইয়া

বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, কত নদী পার হইয়া, কোন্ সাগরে সেতু বাঁধিয়া গিয়া তাঁকে উদ্ধার করেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি দীর্ঘ চিন্তায় জাল বুনিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না,দুই হাতে কাজ করিয়াছিলেন—অমন কত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া! আর সে এই একটুতেই ধৈর্য্য হারাইয়া মরিতে চাহিতেছিল।

না—ভিতর হইতে কে যেন জোর করিয়া বলিল,তাকে পাব! তবে?

রঘুনাথ ভাবিল, নামটাতেও তো ভারী আশ্চর্য্য মিল! রঘুনাথ! সেকালের ভগবান রঘুনাথ তাঁর লক্ষ্মীকে হারাইয়া কাতর হইলেও শক্তি হারান নাই···সেও অত-বড় নামের মালিক হইয়া তার লক্ষ্মীকে হারাইয়া শক্তি হারাইবে? না।

* * * *

পরদিন ভোরে উঠিয়া রঘুনাথ অধীরভাবে বাড়ীর সামনের পথে পায়চারি করিতেছিল। যতীশ আসিয়া ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

রঘুনাথ যতীশকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন, বলিলেন—তোমার মা উঠেচেন?

যতীশ বলিল,—উঠেচেন।

রঘুনাথ বাড়ীর মধ্যে গেল। যতীশের মা রোয়াকে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া তিনি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন, বলিলেন,—মণ্টী এখনো ওঠেনি।

রঘুনাথ বলিল,—আজ একটু সকাল সকাল তাকে খাইয়ে দেবেন।

যতীশের মা দুই চোখে প্রশ্ন ভরিয়া রঘুনাথের পানে চাহিলেন। রঘুনাথ বলিল,—আজ আমি বেরুব ওকে নিয়ে। তার পর সে তার সঙ্কল্পের কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া যতীশের মা বলিলেন,—ফিরবে কবে ?

রঘুনাথ বলিল,—তাকে পেলেই।

যতীশের মা বলিলেন,—লক্ষ্মী আমার কাছেই থাকুনা ! পথে ভারী কষ্ট হবে ওর, বাবা।

রঘুনাথ বলিল,—না, না, আমি ওকে আগে দেখবো, যাতে কোন কষ্ট না হয়।

যতীশের মা বলিলেন,—আমরা যে দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকবো এখানে।

রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে মাঝে মাঝে খপর দেব।

যতীশের মা বলিলেন,—কোথায় যাবে ?

রঘুনাথ এ কথার জবাব দিতে পারিল না। কি জবাব দিবে ? সে নিজে জানেও না যে কোথায় কোন্ দিক দিয়া সে সন্ধান সুরু করিবে। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—দেখি, যেতে যেতে যে পথ সাম্‌নে পড়ে, তাই ধরেই যাব।

যতীশের মা বলিলেন,—যা শুনচি, তাতে আমার মনে হয় কলকাতার দিকে খোঁজ নেওয়া দরকার। তা, যে মস্ত সহর—সে কি সহজ কথা ! আমার ভয় হয়, প্রাণেই কি আছে সে ?

রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ ভয় তার প্রাণেও যে বাজিতেছে, নিশিদিন ! কিন্তু তবু মনে হইল, তার লক্ষ্মী—সে জগৎ-সংসারের কিছুই জানে না ! মরিবার কথা মানুষ ভাবিতে পারে, এমন কথাও যে তার মনে পড়িবে না ! তাছাড়া মরা—সে যে বড় শক্ত কাজ। লক্ষ্মী মরিতে জানে না, মরার কোন উপায়ও জানে না যে !

রঘুনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যতীশের মা বলিলেন,—

বেশ, চুপ করে বসে থাকাও তো যায় না। তাই বর! থানার উপর যে কোনো বিশ্বাস নেই! না হলে ওরা মনে করলে কি সন্ধান নিয়ে বার করতে পারে না!

থানা! থানার কথায় রঘুনাথের মনে পড়িল সেই ভাব-হীন মমতা-হীন দুই চোখ, আর সেই দুই হাত—কলের মত খাতার পিঠে শুধু কলম চালাইয়া চলিয়াছে—কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ প্রাণীটি! প্রাণ গেলেও তাদের দ্বারে সে দাঁড়াইতে পারিবে না! শুধু তাদের কাছে কেন, কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া তার এ সর্ব্বনাশের কথা কখনো সে খুলিয়া বলিতে পারিবে না। অন্তরের এই গূঢ়তম গাঢ় বেদনা পরের প্রশ্ন আর পরিহাস-ভরা দৃষ্টির সামনে খুলিয়া ধরিয়া তার অপমান করিবে, এত বড় দরাজ ছাতি তার নাই!

রঘুনাথ বলিল,—নিজেই খুঁজবো।

এমন সময় যতীশ বলিয়া উঠিল,—ঐ যে মন্টী উঠেচে...

সঙ্গে সঙ্গে মন্টী একখানি ডুরে কাপড় গায়ে জড়াইয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, কহিল—মাকে এনেচো বাবা?

এ কথায় স্থানটা এমনি বেদনার সুরে ভরিয়া উঠিল যে সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। যতীশের মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া মন্টীকে বুকে লইলেন, তার মুখে মুখ দিয়া বলিলেন,—এসো তো মা, মুখ ধুইয়ে দি। তার পর বাবার সঙ্গে মার কাছে যাবে।

—মা আসেনি এখানে? বলিয়া মন্টী বাপের পানে চাহিল।

রঘুনাথ মুখ নত করিয়াছিল—সে কথার জবাব দিবার কোন চেষ্টাও করিল না। মনকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল—এমন কথা

প্রতি-নিমেষেই এখন শুনিতে হইবে—উহাতে মনকে দমিতে দেওয়া হইবে না!

আহারে বসিয়া মণ্টী বিষম বায়না লইল, বাবা খাইলে তবে সে খাইবে, নহিলে নয়।

রঘুনাথকে তখন ভাতের কাছে বসিতে হইল এবং মণ্টী তার মুখে এক মুঠা অন্ন গুঁজিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—তুমি খাও মা।

মণ্টা বলিল,—তুমি না খেলে আমি খাবোনা তো—কক্ষনো খাবো না।

রঘুনাথকে তখন খাইতে হইল। দুইজনের আহার শেষ হইলে রঘুনাথ উঠিল; মুখ-হাত ধুইয়া যতীশের মার পায়ের কাছে প্রণাম করিল। তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল,—আশীর্বাদ করুন, যেন হাসি-মুখে আপনার পায়ে তাকে এনে পৌঁছে দিতে পারি।

যতীশ আসিয়া রঘুনাথকে প্রণাম করিলে রঘুনাথ কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু উদাস অশ্রুময় দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল।

যতীশের মা বলিলেন,—আমাদের কলকাতার ঠিকানাটা লিখে দাও যতী। চিঠি দিয়ো, বাবা—আর পেলেই তাকে নিয়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠো। আমি দু'চারদিন পরে চলে যাচ্ছি।

যতীশ মার কথায় একটা কাগজে তাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া আনিয়া রঘুনাথের হাতে দিল। রঘুনাথ কাগজটুকু জামার পকেটে রাখিয়া মণ্টীকে কোলে লইয়া পথে বাহির হইল।

পথে আসিয়া মণ্টী বলিল,—আমায় নামিয়ে দাও, আমি হাঁটবো। হাঁটতে আমি পারি তো।

রঘুনাথ তাহাকে নামাইয়া দিল, দিয়া ভাবিল, এই তো হাঁটার সুরু—কতদিন হাঁটিতে হইবে, তার কি কোন ঠিকানা রাখিস মা!

গ্রামের বুক—দুইধারে তাল-নারিকেল, আম-কাঁঠালের বাগান, মাঝে ধূলা-ভরা পথ। আশে-পাশে চালা ঘর। কাহারো চালে নানা লতা-পাতা গজাইয়া চালের খড় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! রঘুনাথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ঘাটের পথে আসিল। তারপর ভাবিল, বাড়ীর পথে নয়। এখনি মন্টী সহস্র প্রশ্ন তুলিয়া এমন আকুল করিয়া দিবে, জবাব তো তার দিতেই পারিবে না—মাঝে হইতে বেদনার ঘাগুলা খোঁচা খাইয়া বিষম জ্বালায় টন্‌টন্ করিতে থাকিবে!

ঘাটে আসিয়া মাঝিকে সে ওপারে অনেকটা দূরে নামাইয়া দিতে বলিল। নৌকা চলিল। জলের ছোট ছোট ঢেউ ভাঙিয়া নৌকার দুইধারে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল! কি বেদনার সুর ও—কি দরদে-ভরা কল-কল্লোল!

রঘুনাথ আকাশের পানে চাহিল। ঐ আকাশ,—দুই দিন পূর্ব্বে যে আকাশ উপর হইতেই তার ছোট্ট গণ্ডীঘেরা বিপুল সুখ চোখ মেলিয়া দেখিয়াছে—আর এও সেই বাতাস, যার পরশ তার অঙ্গে অমৃত ছিটাইয়াছে! আজ…?

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। মন্টী বলিল,—আমাদের বাড়ী কৈ, বাবা? এবং তার জবাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিল,—মা কোথায় গেছে, বাবা? কেন গেছে? কার সঙ্গে গেল? আমায় কেন নিয়ে গেল না? রোসো, আমি মার সঙ্গে কথা কবো না তো! আমায় ফেলে একলা চলে যাওয়া—ভারী দুষ্ট মেয়ে মা—আচ্ছা, আমিও মজা দেখাবো'খন।

রঘুনাথ বলিল,—চেয়ে ভাখো মন্টী, কেমন ছোট ছোট ঢেউ, কেমন নৌকো চলছে—

মন্টী সে কথায় কাণ না দিয়াই প্রশ্নের বস্তু বহাইয়া চলিল।

পারে আসিয়া রঘুনাথ মন্টীকে লইয়া একটা পথে চলিল। এ পথে লোকের ভিড় নাই।° পথটা গিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। রঘুনাথ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, আঃ, এ পথে আসিয়া লোকের প্রশ্নগুলাকে খুব ফাঁকি দেওয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ হাঁটিয়া মাঠ পার হইয়া একটা জলার ধারে আসিয়া রঘুনাথ বসিল। মন্টী বলিল,—বসলে কেন বাবা? চলো না...রাত্তির হয়ে যাবে যে নৈলে—

রঘুনাথ বলিল,—একটু জিরোও মা। এমন কতদিন হাঁটতে হবে তা তো জানো না!

মন্টী রঘুনাথের পানে চাহিল। তার অর্থ,...এ কথার মানে?

রঘুনাথ চাদরের খুঁট খুলিয়া কতকগুলা মুড়ি ও কিছু মিষ্টান্ন মন্টীর সামনে ধরিয়া বলিল,—খাও। একটু খেয়ে নাও, আবার হাঁটবো।

মন্টী বলিল,—তুমি খাও, তবে খাবো।

তর্ক করা রঘুনাথের সহ্য হইতেছিল না। কি জানি. আবার মন্টী কি প্রশ্ন করিয়া বসিবে! সেও মেয়ের সঙ্গে মিলিয়া মুড়ি মুখে দিল।

— ১২ —

সাত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা বেলা মালী একটু আগে লক্ষ্মীর ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী এ সাত দিন সহস্রবার ভাবিয়াছে, মরিবে...মরণের জন্ত প্রস্তুতও হইয়াছে, তবু মরিতে পারে নাই। মরিব মনে করা যত

সহজ, মরা তেমন নয়। বিশেষ বাঙালীর ঘরে, দুঃখী বাঙালীর ঘরে মরণ বড় চট্ করিয়া মেয়েদের স্পর্শ করিতে চায় না। অতি দুঃখে পড়িয়া আশার শেষ খেই হারাইয়াও বাঙালীর মেয়ে পড়িয়া পড়িয়া দুঃখ সয়—এ তো লক্ষ্মী এখনো আশা ছাড়িতে পারে নাই! স্বামী, মেয়ে, স্বামীর ঘর...কোথা হইতে এ দুর্দ্দিনেও তাকে এমন বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে লক্ষ্মী বার বার মরিতে গিয়াও শুধু তাদের মুখ চাহিয়া মাটীতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়াও বাঁচিয়া রহিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার পরেই চাঁদের জ্যোৎস্না ঘরের মেঝের পড়িয়া লুকোচুরি খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। এ কয়দিন রজনী আসিয়া বাহির হইতেই চলিয়া গিয়াছে; দ্বারের অন্তরাল হইতে লক্ষ্মীর খোঁজ করিয়াছে; ঘরে আসে নাই। লক্ষ্মীও কতকটা ভয়ের হাত হইতে নিজেকে তাই মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে।

আজ রাত্রে চাঁদের এই রূপালি আলোয় তার প্রাণের মধ্যে রূপালি তারে দুলিয়া আশা আসিয়া উঁকি দিল। লক্ষ্মী ভাবিল, তবে বোধ হয় তার দুর্গ্রহ কাটিয়া গেল! এবার সে ছুটি পাইবে,—ছুটি! বাহিরের মুক্ত অবাধ বাতাসের পরশে এ দুর্দ্দিনের স্মৃতি ভুলিয়া আবার তার সেই চিরকালের চেনা সহজ পুরাতনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে! দ্বার খুলিয়া মালী ভিতরে আসিল; হাতে জল-খাবারের ঠোঙা। খাবারের ঠোঙা লক্ষ্মীর পায়ের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত বিনীত স্বরে সে বলিল,—খাও মা—

লক্ষ্মী কাতর চোখে মালীর পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, আবার কেন জ্বালাও গো? কিন্তু মূর্খ মালী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। সে শুধু লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী তখন কথা কহিল, একটু ঝাঁজালো স্বরেই বলিল,—কেন বার বার আমায় ত্যক্ত কর তোমরা? এখানকার কোন জিনিষ আমি ছোঁব না! মরে গেলেও নয়!

মালী এ কথায় ব্যথা পাইল। সে বলিল,—এ আমার পয়সায় এনেচি মা—বাবুর পয়সায় নয়।

লক্ষ্মী অবাক হইয়া গেল। এই মূর্খ ছোট লোক মালী—এর প্রাণে এত মমতা, এমন দরদ!

মালী বলিল,—ক'দিন মুখে কিছু দাও নি যে মা—একটু খাও। ...আজ তোমায় আমি বার করে দেবোই। আর একটু রাত হোক্। তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটি বাবুদের বাড়ী রেখে আসব—সে আমি ঠিক করেচি...

লক্ষ্মী আরো বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ আর-একটা চাতুরীর জাল বুনিতেছে না তো! কিন্তু মালীর মুখের ভাব দেখিয়া এ সন্দেহ নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

লক্ষ্মী বলিল,—তারপর তোমার...

কথাটা সে শেষ করিবার পূর্ব্বেই মালী বলিল,—চাকরির কথা বলচো মা! তোমার আশীর্ব্বাদে গতর থাকলে চাকরি ঢের মিলবে।

মালী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর মিনতি-ভরা স্বরে বলিল,—তুমি খাও এবার—না খেলে রাস্তা চল্‌তে পারবে কেন!

এ ব্যাকুল নিবেদন উপেক্ষা করা চলে না—করিবার মত প্রাণও লক্ষ্মীর নয়। লক্ষ্মী মুখ ধুইয়া খাবার মুখে তুলিল।

মালী বলিল, আরো দুইজন মেয়েকে সে এমনি পাহারা দিয়াছে,

এমনি তালা-দেওয়া ঘরে কড়া তদারকে রাখিয়াছে—কিন্তু তারা তো মানুষ নয়! দুই দিন পরেই বাবুর সঙ্গে বেশ বনাইয়া হাসিখুসি করিয়াছে। এবারেও সে ভাবিয়াছিল,...কিন্তু সে ভুল! তাছাড়া লক্ষ্মীর চোখের ঐ কাতর দৃষ্টিতে সে বুনো মালী, তারও প্রাণ টলিয়াছে!

লক্ষ্মী কথা শুনিতে শুনিতে আহার করিতেছিল—হঠাৎ নীচে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। মালী বলিল,—বাবু এল যে! বলিয়াই একটু ব্যাকুল দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চাহিল, বলিল,—কোনো ভয় নেই, মা— বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দ্বারে তালা আঁটিয়া দিল।

লক্ষ্মীর হাতের মিষ্টান্ন হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে ভয়ে একেবারে থ হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য—যে-মুহূর্ত্তে সে ভয় ভুলিয়া মনটাকে আশ্বাসে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক সেই সময়—

বাহিরে রজনীর মত্ত কণ্ঠের স্বর শুনা গেল। রজনী মালীকে ডাকিতেছিল। ঐ দৈত্যের হুঙ্কার জাগিয়াছে—এত দিন পরে আবার···

লক্ষ্মী নিজেকে সম্বৃত করিয়া উদ্যত হইয়া বসিল—এখনি বুঝি পাহাড়ের মত বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে! সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের তালা খুলিয়া রজনী ঘরে ঢুকিল, ডাকিল,—প্রেয়সী...

লক্ষ্মী ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে রক্তটা ভয়ের দোলায় দুলাৎ দুলাৎ করিয়া দুলিতেছিল।

রজনী বলিল,—সাত দিন সময় দিছি! আজ তৈরী—কি বল, প্রেয়সী?···কথা কচ্ছ না যে?

বলিয়াই রজনী আগাইয়া গিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিল। লক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। রজনী তাহাকে জাপ্টাইয়া

ধরিয়া সবলে লক্ষ্মীর অধরে চুম্বন করিল, বলিল,—আঃ, রাধা-ধর-সুধাপান···

লক্ষ্মী প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। শরীরে কোথা হইতে এমন শক্তি আসিয়া দেখা দিল! সে প্রাণপণে ডাকিতেছিল, হে মা কালী, হে ঠাকুর—

রজনী বাঘের মত বিক্রমে লক্ষ্মীকে জাপ্‌টাইয়া কৌচের উপর বসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একটা রক্ত-রাঙা গোলকের মত ঘুরপাক খাইতেছিল। এ গ্রাস হইতে কি করিয়া সে মুক্তি পাইবে! ঠাকুর, ঠাকুর···

হঠাৎ কে আসিয়া দুইজনের মাঝে পড়িয়া দুইজনকে সবলে দুই পাশে হঠাইয়া দিল। রজনী মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছিল—সে ছিট্‌কাইয়া কৌচের নীচে গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী ছিট্‌কাইয়া দূরে আসিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখে, মালী। মালী বলিল,—পালাও, পালাও মা—এখনি পালাও তুমি···

লক্ষ্মী কেমন যেন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মালী তার হাতটা ধরিয়া সজোরে টানিল, বলিল,—পালিয়ে এসো, শীগগির...

লক্ষ্মী তখন বুঝিল, এ কি কাণ্ড চলিয়াছে—আর এ কি মস্ত সুযোগ তার সামনে! সে ছুটিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। রজনীও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার আগলাইল। মালী রজনীর হাত ধরিয়া সজোরে আবার ধাক্কা দিল—রজনী গিয়া পড়িল কৌচের পায়ার কাছে।

—তবে রে বেটা ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে—বলিয়া মালীকে আক্রমণ

করিবার জন্ত যেমন সে উঠিতে যাইবে, ঠিক সেই ফাঁকে মালী লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। লক্ষ্মীর সমস্ত চেতনা অমনি নিমেষে জাগিয়া উঠিল; এবং সে আর কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সিঁড়ি টপ্‌কাইয়া নীচে নামিয়া আসিল।

রজনী উঠিয়া দেখে, লক্ষ্মী ঘরে নাই। মালীর উপর তার প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। কিন্তু লক্ষ্মী যে সরিয়া পলায়! মালীকে ছাড়িয়া সে তখন লক্ষ্মীর পিছনে ছুটিতে উদ্যত হইল।—মালী বাধা দিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। তখন সমস্ত ক্রোধ এ বাধায় নাড়া পাইয়া বিপুল বিক্রমে মালীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিল-চড়-লাথিতে মালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রজনী শেষে তাকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া সিঁড়ির উপর হইতে সজোরে এমন ধাক্কা দিল যে মালী গড়াইতে গড়াইতে গিয়া নীচে পড়িল। রজনীও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া টলিতে টলিতেই নীচে নামিয়া আসিল এবং এধারে ওধারে চাহিয়া একেবারে বাগানের ফটক অবধি চলিয়া গেল। ঐ পথ…জন-প্রাণীর সাড়া নাই, শব্দ নাই, এবং চাঁদের আলোয় মাতালের চোখেও যতদূর দেখা যায়, কাহারো কোন চিহ্নও নাই! রজনী ফিরিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। ড্রাইভারটা তখন চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল; রজনী তাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল,—চালাও—আস্তে যাও—

ড্রাইভার ব্যাপার না বুঝিয়াই মনিবের আদেশ পালন করিল।

সে গাড়ী ধীরে ধীরে পথে বাহির করিয়া ধীরে ধীরেই চালাইল—আর রজনীও গাড়ীতে বসিয়া দুই চোখে ক্ষুধাতুর লোলুপ দৃষ্টি ভরিয়া পথের সামনে পিছনে ডাহিনে বামে চারিধারে তাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোথায় গেল সে?…কোথাও নাই!

বাহির হইয়া লক্ষ্মী পথে আসে নাই। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে ফটকের ওদিকে যাইতে তার পা ওঠে নাই। সে ঐ পাতার ঢাকা আলো-মাখা ঝাপসা জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেদিকে দুই চোখ যায় সমান ছুটিয়া চলিয়াছিল। বাগানের বেড়া টপ্‌কাইয়া, দুই হাতে জঙ্গল ঠেলিয়া সে চলিয়াছিল। পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, গায়ে গাছের ডালে ধাক্কা লাগিতেছে—সে দিকে তার খেয়ালও নাই—চলিয়াছে, সোজা চলিয়াছে, অতি-সন্তর্পণে, গাছের শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ না ধ্বনিয়া ওঠে, সে শব্দ বাঁচাইয়া,—মাঝে মাঝে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া। পিছন-পানেও সে চাহিয়া দেখিতেছিল, পিছনে কেহ ধাওয়া করিয়া আসিতেছে কি না!

এমনি করিয়া সারা রাত্রি সে চলিল। জঙ্গল ঠেলিয়া, খানা ডিঙ্গাইয়া, গলি পার হইয়া, বেড়া টপকাইয়া—বাগানের পর বাগান ছাড়াইয়া; কেবল বড় রাস্তায় গেল না। কি জানি, যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যদি কেহ প্রশ্ন তোলে, তুমি কে? কোথায় চলিয়াছ? পা ভারী হইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতে চায়, দেহের ভার আর সে বহিতে পারে না—তবু লক্ষ্মী সমানে চলিয়াছে! চলার তার আর বিরাম নাই! মনের মধ্যে আশাও জাগিতেছিল, যদি ভোরের দিকে চোখে পড়ে, সেই তার চির-পরিচিত সোনার ঘরখানি...

চলিতে চলিতে মাথার উপর জ্যোৎস্না ফিকে হইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, তার পর কোথায় তা উবিয়া গিয়া চারিধার আঁধারে ভরিয়া উঠিল। সেই আঁধারেই লক্ষ্মী চলিয়াছে, লক্ষ্যহীন, দিকবিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, দম-খাওয়া পুতুলের মত!

শেষে গাছের পাতার আড়ে ভোরের পাখীর গুঞ্জন জাগিয়া উঠিল—

নানা পতঙ্গের বিচিত্র কল্লোলে ফুটল—তবু লক্ষ্মী চলিয়াছে। পা দুইটা এমন টাটাইয়া উঠিয়াছে যে সে আর চলে না! মনে হয়, এবার কোথাও পড়িয়া জন্মের মত এ চলায় বিরাম দিতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়।

গাছের ডাল-পাতা ফুঁড়িয়া ক্রমে ভোরের দিকে গোলাপী আলো ঝরিয়া পড়িল। মাতালের মত টলিতে টলিতে লক্ষ্মী আসিয়া একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মাথা ঘুরিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, সে যেন ঠিক স্নান করিয়া উঠিয়াছে! ঘুমে তার চোখ ঢুলিয়া আসিতেছিল! জোর করিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি! রাত্রির অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যেও যে বড় রাস্তাটাকে দূরে রাখিয়া চলিয়াছে, ভোরের আলোয় সেই বড় রাস্তার ধারেই নিজেকে আনিয়া ফেলিল! উপায়?

উপায় নাই! পাও আর চলে না। সেই পোড়ো বাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, ভগবান!

হায়রে, ভগবানকে ডাকিয়া কোন ফল নাই! অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারে যদি তাঁর কোন হাত থাকিত, তাহা হইলে তাঁর পায়ের কাছে দুঃখীর বেদনার অশ্রু এমন ভাবে নিত্য পুঞ্জিত হইয়া ভোগবতী গঙ্গার সৃষ্টি করিতে পারিত না! দুঃখীর দুঃখ যদি তিনি তার মিনতির প্রার্থনায় ঘুচাইতেন, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে দুঃখ থাকিত কি! তাহা হইলে কে তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া নিত্য এমন আকুল আবেদনে আকাশ-বাতাস ভারী করিয়া তুলিত! তাঁর নামই তাহা হইলে পৃথিবীর বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত! দুঃখী ডাকিয়া নিরাশ হয়, তার দুঃখও ঘোচে না, তবু লোকে কোন দিকে আর

কাহাকেও না পাইয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে...ভাগ্যের এ কি বিড়ম্বনা !

লক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিল। তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সেইখানে পড়িয়াই সে চোখ বুজিল।

— ১৩ —

একটু বেলা ফুটিতেই সে পথে প্রথম আসিয়া দেখা দিল, হরকান্ত। সর্ব্বরকম নেশার সাধনা করিয়া সে একেবারে দিগ্‌গজ বনিয়াছে। এই পোড়ো বাড়ীটা তাদের দলের আড্ডা। সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত এখানে মস্ত ভিড় জমে এবং সে ভিড়ের সভায় দেশের লাটসাহেবের সফরে বাহির হওয়ার খরচ হইতে সুরু করিয়া মায় আজ-কালের বাজারের চড়া দর অবধি কোন আলোচনাই বাদ যায় না ! এমন কি সঙ্গে সঙ্গে মানব-দেহকে সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে আপ্যায়িত করিতে কোথায় কি সরঞ্জাম সজ্জিত বা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কারান্তে তাহা সংগ্রহ—এ সমস্তের কিছুই বকেয়া পড়িয়া থাকে না। এই দলের হুঙ্কারে পোড়ো বাড়ীটা পাড়ার রমণী-বৃন্দের কাছে একটা আতঙ্কের জায়গা বলিয়া এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে সন্ধ্যার পর একলা এধার মাড়াইতে তাহাদের কাহারো ভরসা হয় না।

হরকান্ত কোন্ পুকুরে মাছ ধরিয়া সে দিনটা সুখে অতিবাহিত করা যায় তাহারি সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ আড্ডা-ঘরের সামনে মূর্চ্ছিত নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া সে কৌতুহলী হইয়া কাছে আসিল এবং যখন দেখিল, মূর্ত্তিখানি শুধু নারীর নয়, তরুণী এবং অপূর্ব্ব সুন্দরীর, তখন পরম উল্লাসে তার চিত্ত নাচিয়া উঠিল। সে সে-মূর্ত্তির কাছে আসিল এবং

কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্বাস অনুভব করিবার জন্য তার নাকের কাছে হাত লইয়া গেল। এই যে, নিশ্বাস পড়িতেছে!

হরকান্ত তখন তরুণীকে একটু নাড়া দিল—সে নাড়ায় লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়াই এ মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।...আবার! এখনো বিরাম নাই!

হরকান্ত তখন তাহাকে তুলিয়া ধরিতে গেল। বিপদ বুঝিয়া লক্ষ্মী অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আত্মরক্ষার জন্য ছুটিয়া পলাইতে গিয়া দেখিল, পা তার এমন ভারী আর টাটাইয়া রহিয়াছে, যে নড়ার শক্তি নাই। তবু সে ছুটিবার চেষ্টা করিল। শীকার ফস্‌কায় দেখিয়া হরকান্ত তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। লক্ষ্মী সে আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যুঝিতে লাগিল—কিন্তু হায়, হাত-পা নিতান্তই অবশ, শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই—সমস্ত শরীরটাকে কে যেন দুম্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তার দুই চোখে জল আসিল। তার ক্ষুদ্র গৃহ-কোণ হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাকে এ কোন্ পথে আজ দাঁড় করাইলে, ঠাকুর! চারিদিকে পুরুষের তীব্র লালসা লোলুপ হাত বিস্তার করিয়া কেবলি নারীকে গ্রাস করিতে চায়! এ কি লজ্জা, এ কি দুর্ভাগ্য! পুরুষকে কি তুমি সৃষ্টি কর নাই, ভগবান!

ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সে লড়িতে লাগিল। তার হাত ফস্কাইয়া লক্ষ্মী একটু ছুটিবার চেষ্টা করে, ছুটিতে গিয়া অমনি হাঁপাইয়া পড়ে—হরকান্ত গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। লক্ষ্মী আশা হারাইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল।

ওধারে একটা গলি বাঁকিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ী বড় রাস্তায় দেখা দিল। গাড়ীখানা এই দিকেই আসিতেছিল। লক্ষ্মী একবার

চকিতের জন্ত গাড়ীটা লক্ষ্য করিল—তারপর চোখের সামনে সব অন্ধকার! হরকান্ত তখন তাহাকে একেবার আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়ী কাছে আসিল। কাছে আসিতেই গাড়ীর খোলা ফিরকির মধ্য দিয়া একমাত্র আরোহী এক তরুণী মুখ বাড়াইয়া পথে এই কাণ্ড দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া সেখানে আসিয়া বলিল,—এ কি এ!

হরকান্ত তার পানে চাহিল। তরুণী সুন্দরী, পরণে খদ্দরের শাড়ী, গায়ে খদ্দরের জামা, পায়ে নাগরা জুতা। তাকে দেখিয়া হরকান্ত থ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর তার শীকারের দিকে আবার মনঃসংযোগ করিল। লক্ষ্মী তখন আর একেবারে ছুটিবার চেষ্টা করিল।

তরুণী ব্যাপার বুঝিয়া হরকান্তর হাত ধরিয়া ঝটকা দিল, তীব্র স্বরে কহিল,— ছাড়ো।

হরকান্ত চোখ পাকাইয়া একটা তীব্র হাস্য করিল। তরুণী তখন চকিতে গিয়া গাড়োয়ানের হাত হইতে চাবুক আনিয়া সজোরে তার পিঠে সপা-সপ্ বসাইয়া দিল।

আচম্কা ছিপটি খাইয়া হরকান্ত ভড়্কাইয়া তরুণীর পানে চাহিল। চাহিতেই মুখের উপর শপাৎ করিয়া চাবুক পড়িল—চাবুকের পর চাবুক। তার গাল কাটিয়া রক্ত বহিল এবং প্রহারে জর্জ্জরিত হরকান্ত বেত্রাহত কুকুরের মত ত্রস্তে পলাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিল।

তরুণী তখন লক্ষ্মীকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল,—এর মানে কি?

লক্ষ্মী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—অত্যাচার—

তার মুখে আর কথা ফুটিল না। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া

যাইতেছিল, তরুণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া এক রকম টানিয়াই তাহাকে আনিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিল। লক্ষ্মীর হাত-পা ঝিমঝিম করিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে সুরু করিল। টলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িল।

তরুণী গাড়োয়ানকে সঙ্কেত করিল, চালাও!

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া তীব্র বেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

অনেকখানি পথ চলিয়া আসিবার পর আতঙ্ক কাটিলে লক্ষ্মী আবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তরুণী দুইহাতে ধরিয়া তার মুখখানি বুকের উপর তুলিয়া কহিল—ভয় নেই। তুমি আমার কাছে আছ।

লক্ষ্মী উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া রহিল—তার চোখের সামনে তখনো যেন একরাশ দৈত্যের কালো-কালো ভীষণ মূর্ত্তি তাণ্ডবের তালে নৃত্য করিতেছিল!

তরুণী বলিল,—আর ভয় কি! চাও, চোখ মেলে চাও—

এই কোমল দরদ-ভরা স্বরে লক্ষ্মীর বেদনাহত মনের উপর শান্ত শীতল বাতাসের পরশ ভাসিয়া আসিল। তার আরাম বোধ হইল।

তরুণী বলিল,—বেশ, আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোও তুমি...

লক্ষ্মী বিস্মিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া শুধু প্রশ্ন করিল,—তুমি মা ভগবতী?

তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল,—না, আমি কিরণ, তোমার দিদি হই।

এও এই পৃথিবী! এ পৃথিবীতে অত্যাচারের উদ্যত বাহু শত অস্ত্রে মানুষের বুক চিরিয়া তাকে রক্তাক্ত করিয়া তোলে...আবার এই পৃথিবীতেই মমতার স্নিগ্ধ নির্ঝর এমন ঝর-ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে,

যার একটি ঝলক পরশে বুকের সে রক্ত মুছিয়া যায়, সে বেদনাও আরাম পায়। লক্ষ্মী ভাবিল, এ যদি না হইত, তা হইলে এ দুনিয়ায় মানুষ বাস করিতে পারিত কি, ঠাকুর!

কিরণ দেখিল, লক্ষ্মীর চোখে আশ্বাসের আভাস ফুটিলেও তার মন এখনো আতঙ্কের কাঁটাগুলাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। তাকে ভুলাইবার জন্য সে তখন নিজের কথা পাড়িয়া বসিল। কিরণ বলিল,—আমি এধারে এক ঠাকুর-বাড়ীতে এসেছিলুম কাল রাত্রে, পূজা দিতে। ট্যাক্সি খারাপ হয়ে গেল। ভোর অবধি তাই থাকতে হলো! ভোরেও ট্যাক্সি খারাপ দেখে এই গাড়ীটা ভাড়া করে ফিরচি। আমি থাকি কলকাতায়,—ট্রেণে ভিড়ের মধ্যে যেতে ভালবাসি না। এই গাড়ী করে এগুনো যাবে তো—এ গাড়ী সবটা না পারে, পথে আর একটা গাড়ী নিয়েও বাড়ী যেতে পারব। আর খানিক গেলে পথে অন্য ট্যাক্সিও মিলতে পারে! নাহলে ঘোড়ার গাড়ীতে টানা যেতে গেলে বাড়ী পৌছুতে সময় লাগবে ঢের বেশী। আজই দুপুরের আগে আমার ফেরা চাই। সেখানে পরের চাকরি করি, তাই।···যাক, এখন তুমি কোথায় যাবে, বল দিকি! তোমার বাড়ী কোথায়?

এ কথায় লক্ষ্মীর প্রাণটা ধক্ করিয়া উঠিল, বাঁড়ী! সে কোন দিকে, কতদূরে ··তা ছাড়া কার সঙ্গে যাইবে সেখানে! তার চেয়ে...

লক্ষ্মী বলিল,—আজকের মত আমায় একটু আশ্রয় দেবেন, তারপর সন্ধান নিয়ে আমার বাড়ীতেই পৌছে দেবেন।...এই অবধি বলিয়া লক্ষ্মী একটু থামিল, পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—এ ক'দিনে আমার জীবনে কি যে হয়ে গেল···সব কথা আপনাকে বলবো দিদি। এমনও হয়! বলবো, আগে একটু নিশ্বাস নি।

এই কয়টা কথা বলিতে গিয়া লক্ষ্মী কেমন অবশ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে এই কয়দিনের ঘটনাগুলা জলজল করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তার সমস্ত সজীবতা তার সমস্ত ভীষণতাকে আরো প্রচণ্ড তেজে দীপ্ত করিয়া। লক্ষ্মী কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া আবার চোখ বুজিল।

গাড়ী আরো খানিক চলিয়া আসিলে পথেই ট্যাক্সি মিলিয়া গেল। যে ট্যাক্সিতে কিরণ আসিয়াছিল—সেখানাই নিজেকে সারাইয়া তুলিয়া পিছনে ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইল। লক্ষ্মীকে ধরিয়া ট্যাক্সিতে উঠাইয়া কিরণ পাশে বসিল—ড্রাইভার গাড়ীর হুড্ তুলিয়া দিল; তার পর গাড়োয়ানটাকে ভাড়া চুকানো হইলে ট্যাক্সি উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে ট্যাক্সি আসিয়া কলিকাতার এক পথে দোতলা একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দাসী ও ভৃত্য ছুটিয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। ছুটন্ত গাড়ীতে বসিয়া সে দেখিতেছিল, পথে চলন্ত গাছ-পালা আর সহরের মত্ত জনস্রোত—বিদ্যুতের মত তার চোখে পড়িয়া সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে! এ দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নাই। এই নূতন রকম আব-হাওয়ায় তার প্রাণ আতঙ্কের পাশ কাটাইয়া সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। কিরণের বাড়ীতে গাড়ী থামিলে কিরণের সঙ্গে সেও নামিল এবং সকলে ভিতরে ঢুকিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া কিরণ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিল,—ওপরে এসো। ঝীকে আদেশ দিল,—শীগগির দু'পেয়ালা চা তৈরী করে আন্ দিকি, সদু।

. কিরণ লক্ষ্মীকে আনিয়া দোতলায় তার বসিবার ঘরে বসাইল। পরিচ্ছন্ন ঘর—অল্প আসবাবে পরিপাটী সাজানো! চেয়ার, কৌচ...

একধারে একখানি তক্তাপোষে কার্পেট-পাতা বিছানা। লক্ষ্মী আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। কিরণ বলিল,—আমি আসচি। বলিয়াই চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী তখন ঘরখানার চারিধারে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অজানা ঘর—চারিদিকে তবু মুক্তির কি স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছে! আলো, আলো, হাওয়া, হাওয়া…এই দুইটা জিনিষের কথা এ কয়দিন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! এই আলো আর মুক্ত হাওয়ার পরশ পাইয়া তার প্রাণের গোপন কোণে পুঞ্জিত যা-কিছু ভয় আতঙ্ক উদ্বেগ, সব ছিট্‌কাইয়া কোথায় সরিয়া গেল! লক্ষ্মীর মনে হইল, কে এ মানুষটী—চোখে-মুখে স্নেহের উজ্জ্বল দীপ্তি, গতিতে সহজ সারল্য—এ কি তার স্বপ্নের দেবী? ও কয়দিন আঁধার কারাগৃহে পড়িয়া কেবলি সে ব্যাকুল নিবেদন জানাইয়াছে, তাই আজ এই বেশে দেখা দিয়া তিনিই কি তার সকল দুঃখের অবসান করিলেন! তার এক-একবার এমনো মনে হইতেছিল, এটা সত্য, না, আবার এ স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে! দুই চোখ রগড়াইয়া সাফ করিয়া সে চাহিল। না, সত্য—এ সব সত্য—ঐ আকাশ, ঐ আলো, এই শয্যা—এ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়,—এ সত্য, সব সত্য!

এমনি ভাবে মনটা যখন দোল খাইতেছে, তখন কিরণ আসিয়া বলিল,—এসো দিকি, তোমার চুলটুলগুলো ঠিক করে দি—জট পাকিয়ে যেন দড়ি হয়েছে! আর মুখের এ কি শ্রী…

কিরণ লক্ষ্মীর চুল খুলিয়া চিরুণী লইয়া তার জট ছাড়াইতে বসিল। লক্ষ্মী বলিল,—থাক দিদি—

কিরণ বলিল,—কেন থাক্‌বে!

লক্ষ্মী কিছু বলিতে পারিল না—তার দুই চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। কার জন্যই বা…সে নিশ্বাস ফেলিল।

দাসী চা আনিল। কিরণ বলিল,—খাও, শরীরে একটু জুৎ পাবে'খন।

লক্ষ্মীর মুখে কিরণ চায়ের পেয়ালা ধরিল। এ বস্তু একেবারে নূতন! তবু কিরণের কথা ঠেলিতে তার প্রাণে বাজিল। নিজের হাতে পেয়ালাটা লইয়া সে বলিল,—আর কেন দিদি, এ সব? আমার এখন মলেই হয়।

কিরণ অত্যন্ত কাতর চোখে লক্ষ্মীর দিকে চাহিল। লক্ষ্মীর এই ফুটন্ত লাবণ্যের মাঝে অতি তীব্র বেদনার কাঁটা যে এখনো ফুটিয়া আছে, কিরণ তা বুঝিল। বুঝিয়া সমস্ত ব্যাপারখানা আগাগোড়া জানিবার জন্য তার বড় কৌতূহল হইল—কিন্তু কৌতূহল তৃপ্তির এ সময় নয়। তাই সে নিজেকে দমন করিয়া বলিল,—খাও বোন—

লক্ষ্মী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। কিরণ চা খাইল; খাইয়া আবার লক্ষ্মীর কেশের রাশি হাতে লইল।

এই কালো কেশের ঘন তরঙ্গ—গোলাপী মুখখানি বেড়িয়া কি সুষমারই না সৃষ্টি করিয়াছে!

কেশের জট ছাড়াইয়া সুগন্ধি তৈল আনিয়া কিরণ লক্ষ্মীর কেশে ভালো করিয়া মাখাইয়া দিল—তার পর নিজেও তেল মাখিল। তেল মাখিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে স্নান করিতে গেল। স্নানের পর লক্ষ্মীর সিঁথির আগায় ভালো করিয়া সিঁদুর পরাইয়া কিরণ বহুক্ষণ তার মুখখানি ধরিয়া ধরিয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল,—এ যে ভগবতীর মুখ, বোন! তা বনের মাঝে ও বিপদের মাঝে পড়লে কি করে?

লক্ষ্মী বলিল,—সব কথা তোমায় বলচি দিদি।

তার পর কিরণের বুকে মুখ রাখিয়া কখনো থামিয়া কখনো চোখের জল ফেলিয়া কোন রকমে লক্ষ্মী আপনার কাহিনী আগাগোড়া খুলিয়া বলিল। নদীর ধারে সুখের ঘর, সুখের ঘর-কন্না—স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালোবাসা—এ লইয়া স্বর্গ রচিয়া বসিয়াছিল সে। তারপর কি করিয়া এক দৈত্য আসিয়া দেখা দিল, কি করিয়া তাকে সে ঘর হইতে ছিনাইয়া আনিল, আনিয়া বন্দী করিল—তার পর অত্যাচারের প্রচণ্ড চেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে লক্ষ্মীর অবিরাম সংগ্রাম—শেষে এক ছোটলোক মালীর সাহায্যে কি করিয়া রক্ষা পাইল, এবং রক্ষা পাইয়া পলায়ন করিল; অত রাত্রে বনে জঙ্গলে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত দুই পা টানিয়া সেই পোড়ো-বাড়ীর সামনে পড়িয়াছিল—সেখানেও ঐ উপদ্রব! তারপর দেবী ভগবতীর মতই কিরণ আসিয়া রক্ষা করিল—দৈত্যটাকে হঠাইয়া দিয়া নিজের বুকে নিরাপদ নীড়ে তাকে তুলিয়া লইয়াছে—সব কথাই সে খুলিয়া বলিল। কিরণ মনোযোগ দিয়া তার কথা শুনিল। শুনিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় পুলকে তার মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তুমি একটু জিরোও, ভাই। আমি এখনি আসচি।

দুঃস্বপ্নের মত এই রাজ্যের বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়া কিরণের গৃহে নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া লক্ষ্মীর মন তখন নানা চিন্তার গহনে ঘুরিতে লাগিল। যে-মন কোনরূপ আশা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল, সহসা বিপদের আঁধার কাটাইয়া এই আলোর রাজ্যে আসিয়া আবার সে মন আশার বীণায় মনের তার জুড়িয়া দিল। তার সব-চেয়ে বিস্ময় লাগিয়াছিল এই রক্ষাকর্ত্রী আশ্রয়দাত্রীটিকে! বয়স অল্প, রূপে বিদ্যুৎ ঝরিতেছে, বাঙালীর মেয়ে—অথচ গতিতে ভঙ্গীতে কি

স্বচ্ছতা, কি সরল শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে! কোথাও এতটুকু চাপল্য নাই, আর লজ্জার একটা জড় আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া সঙের মত এ কোথাও চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট খাড়া থাকে না! সেই যখন পথের মাঝে সে লোকটা বর্ব্বরের মত তাকে আক্রমণ করিল, তখন অন্য নারী হইলে কি করিত! ভয়ে হয়তো কোথাও পলাইয়া যাইত—আর এ...? কি দীপ্ত তেজে দেবী সিংহবাহিনীর মতই অসুরটাকে কশাঘাতে জর্জ্জর করিয়া হঠাইয়া তাকে কত বড় লজ্জা, কত বড় অপমান হইতে রক্ষা করিল। এও বাঙালীর মেয়ে! সে-ও বাঙালীর মেয়ে। পুরুষের কুশ্রী ক্ষুধিত দৃষ্টি, জঘন্য কথার সামনে সে কুঁকড়াইয়া সরিয়া নিজেকে যেখানে আরো বিপন্ন করিয়া তোলে, এ সেখানে সে সব দৃষ্টি আর কথাগুলাকে কি উপেক্ষার ভরেই না দুই পায়ে মাড়াইয়া চলে! ঘরে-বাহিরে নিজের সুন্দর কুণ্ঠাটুকু বজায় রাখিয়া নিজের নারীত্বের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া কিরণ এ কত বড় বিপদে তাকে কি সহজেই না রক্ষা করিয়াছে! কৃতজ্ঞতায় কিরণের পায়ে নিজের চিত্তকে সে একেবারে লুণ্ঠিত করিয়া দিল।

কিন্তু এখন? এর পরে তার পথ কোথায়, গতি কোন্ দিকে ফিরিবে!...ঘর? ঘরে কি তিনি আছেন? এতগুলা দিন কাটিয়া গেল! লক্ষ্মীকে ঘরে না পাইয়া মন্টী কাঁদিয়া হয়তো মরিয়াই গিয়াছে—আর তিনি?...দুই-দুইটা শোকের ঘায়ে হয় পাগল হইয়াছেন, নয়...

শেষের কথাটা ভাবিতে তার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। না, না, এ হইতেই পারে না! তা যদি হইত, এমন সর্ব্বনাশ যদি ঘটিত, তাহা হইলে শেষকালে এমন আশ্চর্য্য উপায়ে নিজের নারীত্বকে সে রক্ষা করিয়া আজ এ আলোর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত কি!

কিন্তু এত দিন কাটাইয়া আজ যদি সে ঘরে ফেরে, পাড়ার লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে, কার সঙ্গে... কোথায় ছিলে? তখন তাদের সে প্রশ্নের জবাবে......

লক্ষ্মীর গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। এত বড় বিপদে এমন রক্ষা পাইবার কথা কে বিশ্বাস করিবে!...আবার পরক্ষণে মনে হইল, তারা না করুক, স্বামী বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু এটুকু সম্বল লইয়া স্বামীর বাহু-পাশে ফিরিয়া স্বামীকে কি সকলের চোখে ঠিক তেমনি ভাবেই তেমনি সম্মানেই সে রাখিতে পারিবে! আড়ালে তারা যদি এ লইয়া তাঁকে বিদ্রূপ করে, টিটকারী দেয়! সে কোন্ ছার,—মহালক্ষ্মী সীতা দেবীকেও রাজ্যের প্রজারা নিন্দা করিয়াছিল, এবং তার ফলে সীতার মত সতীকেও ভগবান রামচন্দ্র গহন-বনে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া ছিলেন!...

এ-সব কথা ভাবিতে গিয়া লক্ষ্মীর সমস্ত ভবিষ্যৎ আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তার জন্য স্বামী লাঞ্ছনা সহিবেন? না!...তার চেয়ে যেমন সে হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে সহসা সে রাত্রে উবিয়া গিয়াছে—তেমনিই জগতের বুক হইতে উবিয়া যাক্!

এমনি চিন্তা করিতে করিতে নিজেকে এই উবাইয়া দিবার কল্পনাটা তাকে এমন পাইয়া বসিল যে তার সামনে হইতে আর সব একেবারে মুছিয়া গেল! মরণ! মরণ! মরণ! চোখের সামনে মরণের কালো পাখা যেন সে মেলানো দেখিল!

কিরণ আসিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া তুলিল, বলিল,—ওঠো তো বোন্—ভাত দিয়েছে।

লক্ষ্মীর তখনো ভ্রান্তি ঘোচে নাই। সে কিরণের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—এসো, খাবে এসো।

লক্ষ্মী তার মুখের উপর 'না' বলিতে পারিল না—ঐ স্নেহে ঢলঢল মুখ, ঐ দরদে ভরা জলজলে দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি! একটি কথাও না বলিয়া সে কিরণের সঙ্গে তার অনুগমন করিল।

উপরে ঘরের সামনেই পাথরে-বাঁধানো দালান। দালানে দুখানি আসন পাতা, আসনের সাম্‌নে অন্নের পাত্র।

কিরণ বলিল,—হাত ধুয়ে খেতে বসো। খেয়ে দেয়ে জিরোও। তোমার এখন সাতদিন ঘুমুলে তবে শরীরে জুৎ আসবে।

লক্ষ্মী ভাতের থালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! কত দিন পরে...! এ অন্নের মুখ এ কয়দিন সে চোখেও দেখে নাই! সেই শেষের দিন রঘুনাথ খাইয়া স্কুলে চলিয়া গেল—মন্টী খাওয়া সারিয়া তুলসীতলার কাছে তার খেলার ঘরে বসিয়া খেলা করিতেছিল—দাওয়ায় বসিয়া রঘুনাথের পাতের অন্ন লক্ষ্মী খুঁটিয়া তুলিল; পরে ভাত খাইয়া বাসনের গোছা লইয়া পুকুর-ঘাটে গেল—বাসন মাজিয়া ভিজা এলোচুলের রাশ পিঠে ঝুলাইয়া পুকুর-পাড় ধরিয়া আসিতেছিল, পাশে নারিকেল গাছের সারি—পুকুরে জলের কোলে কচুর ঝোপ,—সেই ভুলো কুকুরটা...ছবির মত সেদিনকার সে দৃশ্য তার চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল। দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল!...

কিরণ লক্ষ্মীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল, বলিল,—ও কি বোন, কাঁদচো কেন? আর তো কোনো ভয় নেই...

লক্ষ্মী চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কিরণ আদর করিয়া নিজের আঁচলে তার চোখ মুছাইয়া দিল, বলিল,—ছি, কাঁদে কি! খাও—

"এখনি বুঝি পাহাড়ের মত বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে"

লক্ষ্মী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমার সামনে এই মল্লিকা ফুলের মত অন্নের রাশ, আর তারা…

কিরণ একটা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—তিনি পুরুষ মানুষ, কখনই তিনি চুপ করে বসে নেই! মেয়ে? তোমার একারই তো মেয়ে নয়, বোন্—তাঁরও তো বটে!…তাছাড়া ধর, তুমি যদি মরেই যেতে…মেয়েকে তিনি দেখতেন না?

লক্ষ্মীর হাতের ভাত তবুও মুখে উঠিল না। কিরণ আবার বলিল,—এমন করলে তো চলবে না ভাই। বিপদে হা-হুতাশ করলে বিপদ কাটে না, তা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চাই তো! না খেয়ে দুর্ব্বল শরীরে উপায়ই বা ভাববে কি করে! চোখে খালি ঘুম আসবে, মাথাও একেবারে তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মী কথা কহিল, বলিল,—আমার আর কি হবে আশায়, দিদি? সব মিছে। কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে পড়েচি!…এখন মলেই আমি নিশ্চিন্ত হই! আর কেন—! এ যতই ভাবচি, ততই দেখচি, চারিদিকে জট পড়ছে! লক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কিরণ তার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—এতেই তুমি কাতর হয়ে মরতে চাইছ, বোন্!—তবু তোমার সব আছে…। আর আমি? নিজের পায়ে সব হটিয়ে ঠেলে এখনো বেঁচে আছি! শুধু তাই নয়—বেশ আরামেই বাস করছি, দেখচো ত! এমন সাজানো ঘর, কেতা-দুরস্ত সাজ-সজ্জা, বিলাস ভূষণ…কোনটাতেই ত্রুটি নেই!…আমার দশায় যদি পড়তে…

কিরণ কথাটা শেষ করিতে পারিল না—কণ্ঠ বাধিয়া গেল। বহু

দিনকার হারানো কথার রাশ আসিয়া প্রাণটার মধ্যে নিমেষে জড়ো হইল! একটু থামিয়া সে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

লক্ষ্মী একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। এই সহজ সরল মানুষটি—যাকে দেখিলে মনে হয়, দুঃখের মুখও কখনো দেখে নাই—তার প্রাণের মধ্যেও এত বেদনা লুকানো আছে! সহানুভূতিতে তার চিত্ত গলিয়া গেল। সে কিরণের পানে চাহিয়া ডাকিল—দিদি...

কিরণ উদাসভাবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। অতীতের হারানো কথাগুলা প্রাণের মধ্যে ঝড়ের রোল জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই ঘর, সেই ঘরে সেই স্নেহ, সেই প্রীতি—তারপর এক দুরাশার বশে কি আলেয়ার পিছনে ছুটিতে গিয়া সব চুরমার হইয়া গেল! নূতন জগতে এ এক নূতন জীবন...! এর কল্পনাও যে মনের কোণে কোন দিন উঁকি দেয় নাই!

লক্ষ্মী জবাব না পাইয়া ডাকিল,—দিদি—

কিরণের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—ডাক্‌চো?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার দুঃখের কথা আমায় বল, দিদি। আমি ছোট বোন, তাছাড়া লোকের দুঃখের কথা বড় শুনতে ইচ্ছা করে। আমিও দুঃখী, তাই বুঝি এ সাধ হয়। কথাটা বলিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আবেদনের প্রার্থনা ভরিয়া সে কিরণের পানে চাহিল।

কিরণ বলিল,—বলবো বৈ কি, বোন্। স্রোতের মুখে কুটোর মতই ভেসে বেড়াচ্ছিলুম—তুমি এসে স্নেহের সঙ্গ দিয়ে কাছে দাঁড়িয়েচ আজ! তোমায় বলবো বৈ কি! কিন্তু আগে ভাত কটি মুখে দাও। ...মরবে কেন? মানুষ হয়েচ, তায় মেয়ে মানুষ, সইতে হবেই যে।

কাতর হয়ে মরার চেয়ে বিপদের সঙ্গে যোঝায় বেদনার মধ্যেও একটা মস্ত আরাম আছে! সে আরাম আমি ভোগ করেচি—করচিও। আর তুমি মরতে চাইছ!...আজ বাদে কাল, চল, তোমার দেশে খোঁজ করি—ঠিকানা জানো ত, গাঁয়ের নাম জানো ত—তবে? তুমি নিরাশ হও কোন্ দুঃখে, বোন?

এ কথায়ে লক্ষ্মী যেন অকূলে কূল পাইল। তাই তো, সে এমন নিরাশ হইতেছিল কেন! গ্রামের নাম ধরিয়া সন্ধান লইলে সব তো আবার ফিরিয়া পাইবে। রাত্রি—সে তো কাটিয়া গিয়াছে! তা যদি কাটিল তো এ দিনের আলোয় কি কাল্পনিক ভয়ের আভাস জাগাইয়া সে এমন মুষড়াইয়া পড়িতেছে!

লক্ষ্মী খাইতে বসিল। আহারের পর কিরণ তাহাকে লইয়া ঘরে গেল; বিছানা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল,—একটু ঘুমোও।

লক্ষ্মী বলিল,—না, তোমার কথা বল দিদি—

কিরণ বলিল, —বলবো'খন। আমি তো পালাচ্ছি না কোথাও।

লক্ষ্মী বলিল,—না দিদি, বল—আমায় আরো তোমার বুকের কাছে টেনে নাও।

কিরণ ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—বেশ, তবে শোনো—

— ১৪ —

এই সহরের বুকেই একটা গলির মধ্যে কিরণের বাপের বাড়ী। এখনো আছে কি না, কে জানে! সেদিকে পা বাড়াইবার কথা মনে হইলে তার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া ওঠে! তাছাড়া সেখানকার সম্পর্ক... সে তা নিজের হাতে কাটিয়া দিয়া আসিয়াছে!

স্বামীর কথা মনেও পড়ে না। বয়স তখন দশ বৎসর। বাপ গরিব,—দোজবরে বর পাইয়া তার হাতেই কিরণকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়াছে। সে জন্য বাপের উপর রাগ করিবার কিছু নাই, রাগও সে করে নাই কোনদিন। বেচারা বাপ—কি করেন! ত্রিশের নীচের পাত্রেরা এত বেশী টাকা চাহিয়াছিল যে ভিটার সঙ্গে হাড় কয়খানা বেচিলেও বাপের পক্ষে তার জোগাড় করা অসম্ভব ছিল! কাজেই…কিন্তু সে কথা যাক্!

বিবাহের পর দুই-তিনবার সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। স্বামীর পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ে—তিনটি তার চেয়েও ডাগর। কাজেই সেখানে খাপ খাইতে দুই-চারি বৎসর সময় লাগিবে,—এমনি আভাস মনে জাগাইয়া স্বামী তাহাকে বাপের ঘরেই ফেলিয়া রাখিলেন! আর সে দুই-চারি বৎসর কাটিবার পূর্ব্বেই ইহলোকে স্বামীর জীবনের মেয়াদ ফুরাইল—এবং বিবাহের দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কিরণের সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

তার জন্য যে কিরণের মনে কোন বেদনা জাগিয়াছিল, এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বুঝি, সেই পাপেই আজ · সেই কথাই পরে বলিব।

স্বামী চলিয়া গেলেও যৌবন তার দাবী ছাড়িয়া সরিয়া রহিল না তো! মা-বাপের আদরের মাঝে বৈধব্যের আচার ঠেলিয়া যৌবনের লাবণ্য আসিয়া কিরণকে অপূর্ব্ব ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। সেদিকে কিরণের চোখও পড়ে নাই। একদিন পড়াইল একজন—তাকে কেন্দ্র করিয়াই কিরণের এই নূতন জীবনের সূত্রপাত!

বাপের বাড়ীর ঠিক গায়েই ছিল একটা মাঝারি-গোছ বাড়ী।

বাড়ীটা মেরামত হইয়া নব কলেবরে বিদ্যুতের আলোর মালা গলায় দুলাইয়া পাড়ার মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এবং সেই বাড়ীতে বাস করিতে আসিল, কোথাকার এক জমিদারের তরুণ পুত্র, তার কয়জন ভৃত্য লইয়া। জমিদার-পুত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল কলেজে লেখাপড়া করিবার জন্ত!

কিন্তু লেখাপড়ার কেতাবে তার চোখের দৃষ্টি কতখানি ঝুঁকিত, কে তার খোঁজ রাখে! জমিদারের তরুণ পুত্র দুই চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া পাশের এই জীর্ণ গৃহে কিসের সন্ধান করিত, তার খপর কিরণ হাড়ে হাড়ে বুঝিল। তার বয়স তখন ষোল বৎসর। ষোড়শী রূপসীর অঙ্গ বেড়িয়া যে লাবণ্য ঝরিতেছিল, তরুণ নায়ক গোপন অন্তরালে বসিয়া নয়ন দিয়া তাহা পান করিত!

সে দৃষ্টি তীরের মত যেদিন কিরণের গায়ে বিঁধিল, সেদিন সে শিহরিয়া সরিয়া গিয়াছিল। সে দৃষ্টির অর্থও সে ঠিক বোঝে নাই; তবে তার মধ্যে কাঁটার মত কি একটা ছিল, তারি আঘাতে কিরণ বেদনায় কেমন শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তারপর চলিতে ফিরিতে সে সতর্ক দৃষ্টিতে অন্তরাল হইতে সন্ধান করিত, সে চোখের দৃষ্টি আরও শর-নিক্ষেপের জন্ত ব্যাধের মত ওৎ পাতিয়া কোথাও আছে কি না।

এমনি সতর্ক সন্ধানের মাঝ দিয়া চোখে-চোখে মিলিয়া যে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত, সেই বিদ্যুৎই ক্রমে তার পরশে-শিহরণে অন্তরের বিরাগটাকে মাজিয়া ঘষিয়া একদিন এমনি পুলক-ছটায় রূপান্তরিত করিল যে কিরণ তার পরশে মরিল। অর্থাৎ যে দৃষ্টি-পরশকে সে ভয় করিত, যে-দৃষ্টিকে বিরক্তি আর আর উপেক্ষায় সে জর্জরিত করিয়া দিতে ছাড়ে নাই, সেই দৃষ্টিই একদিন এমন সরস মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিল যে ওই

দৃষ্টিটুকুর জন্য তার প্রাণ অধীর উন্মুখ হইয়া থাকিত! রাত্রে বিছানায় পড়িয়া সে ভাবিত, কখন আবার দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীর বাতায়নে সেই চোখের দৃষ্টিতে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া তার শুষ্ক মরুর মত নির্জীব প্রাণে বসন্তের গন্ধ বহিয়া আনিবে। সে দৃষ্টিতে কি অনুরাগ, কি বেদনা, কি মিনতি যে ঝরিয়া পড়িত!

শেষে একদিন চোখের ভাষা চিঠির গায়ে ভাসিয়া তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আদর-ভরা, সোহাগ-ভরা ঠিক যেন গানের মালা! এমন সুরও চিঠির ভাষায় বাজিতে জানে! কিরণের প্রাণটা গন্ধে-বর্ণে ভরিয়া একেবারে মাতাল হইয়া উঠিল। রোজ চিঠি আসিতে লাগিল—হাতের একটা অক্ষর চাহিয়া, একটু স্মৃতি, একটু লেখার পরশ মাগিয়া কি সে আকুল মিনতি! সমস্ত পৃথিবীখানা কিরণের সামনে হইতে উবিয়া গিয়া ঐ এক মিনতির সুরে পাক্‌ খাইয়া ফিরিতেছিল। তার মনে হইত, এ পৃথিবীতে মা নাই, বাপ নাই, ঘর নাই, কেহ নাই, কিছু নাই,—আছে শুধু ঐ প্রাণ-মাতানো সোহাগের সুর! কিরণের মনে হইত, বিশ্বের বাসনা কামনা তার পায়ে নূপুরের মত আঁটিয়া শুধু ঐ একটি সুরই বাজাইয়া চলিয়াছে!

কিরণ চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিল না! রাত্রে সকলে শয়ন করিলে গোপনে উঠিয়া সে কত সতর্ক হইয়া চিঠির জবাব লিখিত! তার পর রাত্রেও—ও-বাড়ীর জানালা দিয়া ঝুলানো সুতায় চিঠিখানি গিয়া গোপনে বাঁধিয়া দিত—আর ভোরে উঠিয়াই দেখিত উঠানের কোণে শিশির-ভেজা দূর্ব্বা-বনে জবাব তার পড়িয়া আছে! সে তার ভোরের পাখী—আবার কি বহিয়া আনিল, শুনিবার জন্য কিরণ চিঠি বুকে করিয়া অন্তরালে চলিয়া যাইত! একবার, দুইবার, শতবার সহস্র-

বার চিঠি পড়িয়া বুকের আঁচলে সেটি লুকাইয়া রাখিত—ওরে আমার ভোরের পাখী, এই বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাক্—দিনের আলোয় লোকের ভিড় কাজের মাঝে অবসর-মত থাকিয়া থাকিয়া তোর সুরে প্রাণ ভরপুর করিয়া তুলিব! তার পর সেই রাত্রির নিশুতি হওয়ার অপেক্ষায় কি অধৈর্য্যেই যে কাল কাটিত—কতক্ষণে জবাব লিখিবে! তা মনে হইলে আজো প্রাণটা বেদনায় ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়ে!

একদিন ভোরে ভোরের পাখী আসিয়া বলিল,—তুমি এসো, কাছে এসো, বুকে এসো, আমার নিখিল জুড়িয়া বসিবে, এসো—নহিলে এ প্রাণ আর রাখিতে পারি না!

এ সুরে সারাদিন মন এমন আচ্ছন্ন রহিল! না গেলে···সর্ব্বনাশ—সব সুখ জন্মের মত খোয়াইয়া বসিবে। তার কাছে ঘর-সংসার বাপ-মা স্নেহ-মায়া সব মিথ্যা বলিয়া মনে হইল, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতই সমস্ত সংসার ছিট্‌কাইয়া সরিয়া গেল। কিরণ জবাব দিল—লইয়া চল গো!

দুনিয়ায় তখন শুধু প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে—আর-সব কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! জগতে শুধু এই দুটী প্রাণী, দুই জনের প্রেমে নির্ভর করিয়া কোন্ নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিতে চায়! লোকালয় ছাড়িয়া সব ছাড়িয়া প্রেমের দায়ে দুইজনে বৈরাগ্য মাগিতে চলিয়াছে!

কিন্তু দুর্য্যোগ নামিল সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে! যেমন জল, তেমনি ঝড়। বিদ্যুতের রোষে-রাঙা আঁখির চক্‌মকানি, সঙ্গে সঙ্গে বাজের তেমনি ভীষণ হুঙ্কার আর গর্জ্জন! ধরণী বুঝি প্রলয়ের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে! সারাক্ষণ কিরণ কি আতঙ্কে কাটাইয়াছিল, সে কেবলি ঠাকুরকে ডাকিয়াছিল,—হে ঠাকুর, আজিকার মত তোমার প্রলয়

থামাইয়া রাখো গো! একবার দুইজনে আমার পাশে দাঁড়াইয়া হাতে হাত রাখি—তারপর আনো তোমার বিরাট আঁধার, বজ্রের হুঙ্কার বিদ্যুতের চমক, মৃত্যুর করাল মূর্তি—কোন ক্ষোভ থাকিবেনা প্রভু!

হায়রে, এ তো দুঃখীর দুঃখ-মোচন নয়, অত্যাচারের প্রতিকার নয়—তাই ঠাকুর সে প্রার্থনা তখনি শুনিলেন! মেঘ-জল দেখিতে দেখিতে থামিয়া শান্ত হইল—স্নান-সারা পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র হাসি ঝরিয়া পড়িল—আকাশে-বাতাসে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্তির দীপ্তি ফুটিল যে দেখিয়া কিরণের প্রাণ একেবারে বিভোর মুগ্ধ হইয়া গেল!

তারপর আরো রাত্রি হইলে চারিধার যখন ঘুমের কোলে নিঝুম স্তব্ধ, কিরণ তখন ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া পথে দাঁড়াইল। জন-হীন পথ—শুধু মাঝে মাঝে আলোর থামগুলা কি একভাবে স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া! কিরণের পা কাঁপিল, গা ছম ছম করিয়া উঠিল—ভয়ে সে আকাশের পানে চাহিল—চাঁদের মুখে কি ও হাসি, যেন বিদ্রূপে ভরা। সমস্ত নিশীথ-আকাশ তার এ নির্লজ্জ অভিসার যাত্রা দেখিয়া একটা টিট্‌কারীর হাসি হাসিতেছে যেন! কিরণের মনে হইল, এ কি করিতেছে সে? এই যে গৃহের দ্বার মাড়াইয়া বাহিরে আসিল, এ দ্বার যদি চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যায়! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—না, ফিরি...

ফিরিবার জন্য পা উঠাইয়াছে, এমন সময় সে আসিয়া হাত ধরিল, ডাকিল,—এসো।

অমনি তার সব চিন্তা সে সুরের তলায় কোথায় যে মুছিয়া গেল! সে স্পর্শে জড় বাহিরের বিশ্ব ঢাকিয়া গেল,—কিরণ চেতনা হারাইয়া

তার হাতে হাত রাখিয়া খানিকটা পথ গিয়া একখানা গাড়ীতে উঠিল। প্রাণের মধ্যে একটা কাঁপন চলিয়া ছিল, তারি দোলায় একটা কথা ভাসিতেছিল, ও দ্বার যদি বন্ধ হয়? যদি...? কিন্তু এই হাতের পরশ হইতে তার স্বর্গ যে নামিয়া আসিতেছে! সে ভাবিল, ও ঘর বন্ধ হয়,... হোক! তারপর গাড়ী যখন রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া পথ সচকিত করিয়া সশব্দে ছুট দিল, তখন কিরণের হঠাৎ মনে হইল, যেন তার সে স্তব্ধ বাড়ীটা বুক ফাটাইয়া তীব্র স্বর তুলিয়া তাকে ডাকিতেছে,— ফিরে আয় ওরে, ফিরে আয়!

হায়রে, সে সোহাগ, সে আদর ঠেলিয়া ফেরা কি যায়! কিরণ ফিরিতে পারিল না। গাড়ী গিয়া একটা বাগানে ঢুকিল। বাগানের মধ্যে বাড়ী। তারি পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ির নীচে গাড়ী থামিতে সে আদর করিয়া কিরণকে নামাইল; তাকে বুকে করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেল। তারপর অধরে অনুরাগের প্রথম পরশ—কিরণ বিহ্বল বিবশ হইয়া চোখ বুজিল!

কি স্বপ্নের মাঝ দিয়াই তারপর কাটিল যে তার দিন আর রাত্রিগুলা! বাড়ীর কথা এক-একবার মনে হইত, কি কান্না, কি শোক সেখানটাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! অমনি সে নিশ্বাস চাপিয়া সেদিক হইতে মনকে সরাইয়া আনিত! এই আলো, হাসি, গান আর সুর, জীবনে আর কিছু নাই। মর্ত্ত্যে নন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে যে!

কিন্তু এ স্বপ্নও ভাঙিল। ছয়মাস না কাটিতে তরুণ প্রমোদ বুঝে দুর্লভ হইয়া উঠিল। অধীর প্রাণে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কিরণের কয়দিন কয় রাত্রি কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! জ্যোৎস্না রাতে বাতায়নে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে সে প্রতীক্ষায় থাকিত, কখন আসিবে সে...

জ্যোৎস্না সারা রাত্রি আকাশের আসরে বিচিত্র তালে নাচিয়া রাত্রি-শেষে ম্লান চোখে শ্রান্ত দেহ এলাইয়া সরিয়া যাইত—তার তখন চমক ভাঙ্গিত, তাই তো, সারা রাত্রি এই বাতায়নে জাগিয়া কাটিল! সে তো আসিল না!...শেষে খপর আসিল, তরুণের নেশা কাটিয়াছে এখন নূতন ফুলে নূতন মধু-পানে বিভোর সে!

নিমেষে কিরণ বুঝিল, সে কি বেশে এখানে আসিয়া তার সর্ব্বস্ব দিয়া কি ভাবেই না নিজেকে রিক্ত নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে! নারীর নারীত্ব একটা ইতরের ছলনায় ভুলিয়া এমন হেলায় সে হারাইয়া বসিয়াছে! নেশায় মাতিয়া সে এ কি করিয়াছে! প্রাণের মধ্যে আলো জ্বালিতে গিয়া তারি তীব্র শিখায় প্রাণটাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে! ফুল বলিয়া যাকে সে মাথায় তুলিয়াছিল, সে তো ফুল নয়—সাপ, বিষধর সাপ! নিজের সর্ব্বনাশ সে নিজে করিয়াছে, প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া! আজ সে জগতের বুকে পড়িয়া আছে, দীন, রিক্ত, সর্ব্বহারা! শুধু তাই নয়, মাথায় যে পশরা ধরিয়াছে আজ...

ক্ষোভে অনুশোচনায় কিরণ পাগল হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই দুই চোখ উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলি! এই রূপ, এই যৌবন, এই দেহ—যারা অমন চক্রান্ত করিয়া তার নারীত্বটাকে দুই পায়ে মাড়াইয়া থেঁৎলাইয়া চুরমার করিয়া দিল, সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই দেহটাকে ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে! নিজের উপর এমন রাগ ধরিল যে সে মরিবে বলিয়া ছাদে উঠিল। তখন সন্ধ্যার আকাশ অপূর্ব্ব রক্তরাগে উজ্জ্বল! ঝাঁপ দিবে, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, সে-ই তো গেল—কিন্তু যে তার এ সর্ব্বনাশ করিল, সেই ঠক, প্রতারক, ভণ্ড, তার তো কিছু হইল না! সে পরম আরামে নিশ্চিন্ত সুখে

তার সেই চিরদিনকার জগতের বুকে তেমনি অনায়াসে তেমনি নিঃসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়াইবে!...তাকে যদি আজ সামনে পাওয়া যাইত ..ওঃ!

কিন্তু না,—মিছা এ রাগ! সে তো হাত ধরিয়া এ পথে তাকে টানিয়া আনে নাই! কিরণ নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে চিঠি লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল? বলুক—কেন কিরণ তখন তার মুখের উপর ঘৃণার চাবুক মারিয়া বলে নাই, কে তুমি ভুলাইতে চাও আমায় এমনি ছলনায়! কথার কুহকে ভুলাইয়া বাহিরে ডাকো! যখন সে হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, এসো, কেন সে তখন তার মুখের উপর তীব্র হুঙ্কারে বলিয়া উঠিল না,—যে, না, আমি যাইব না! ইচ্ছা করিয়া বিপথে আসিয়া পরকে আজ চোখ রাঙানো? এ শুধু নিজেকে প্রতারণা করা! তার মনে এ সাধ জাগিয়াছিল। বাহিরে ডাকের জন্য সে উন্মুখ অধীর ছিল, তাই তো আজ ঘর-ছাড়া, সব-ছাড়া, পথের মানুষ সে! যেদিন প্রথম সে চোখের দৃষ্টি তার গায়ে তীরের মত বিঁধিয়াছিল, সেইদিনই কেন সে তাকে দুইহাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিয়া দূর করিয়া দেয় নাই? আজ সে ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া নিজেকে সব দোষে খালাস রাখিয়া, যত দোষ তার ঘাড়েই চাপাইতে চলিয়াছে—বটে!

কিরণ মরিবে না। সে স্থির করিল, মরা হইবে না। যে-মন অমন পরের ছলনায় ভুলাইয়া তার নারীত্বের অপমান করিয়াছে, সমস্ত জীবনটাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মনটাকে মাজিয়া সাফ করিয়া ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিবে সে। কাজের মাঝে ভুলাইয়া

খাটাইয়া তাকে দিয়া এ আরাম, এ বিলাসের চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইবে সে।

গহনা-পত্র ও টাকাকড়ি তরুণ নায়ক তার পায়ে রাশীকৃত জমা করিয়াছিল। স্যাকরা ডাকাইয়া কিরণ সে-সব বিক্রয় করিল। টাকা খরচ করিয়া বহু তীর্থে সে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু প্রাণের মধ্যে স্মৃতির জ্বালা আর থামিতে চায় না! ঠাকুর দেখিয়াও থামে না, সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা গায়ে মাখিয়াও সে জ্বালা জুড়াইতে চায় না! বিরক্ত হইয়া সে আবার সহরে আসিল। মনকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে, তবু সেই স্মৃতির জ্বালা! শেষে সে ঠিক করিল, সে থিয়েটারে ঢুকিবে, অভিনেত্রী হইবে। ঐ পথেই শুধু নিজেকে ভোলা যায়! আজ রাণী সাজিয়া কাল দাসী সাজিয়া সেই রাণী আর দাসীর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সে ডুবাইয়া দিবে! নানা চরিত্রের ভূমিকার মাঝে আপনাকে যদি ভোলা যায়!

কিরণ থিয়েটারে ঢুকিল! অল্প দিনেই তার খ্যাতি চারিদিকে রটিয়া গেল। বাপের দেওয়া নামটা সে চিরকালের জন্য ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছে—সে আদরের নামটার অপমান আর না হয়! সে নামের কথা মনে হইলে কিরণ ভাবে, সে মরিয়াছে। কিরণ,...সে এক সম্পূর্ণ নূতন লোক!

পয়সার এখন তার অভাব নাই! সে পয়সায় নিজেও সে ভদ্রভাবেই বাস করিতে চায়। তার এ পয়সা শুধু নিজের পিছনেই ব্যয় করে না। কেহ আসিয়া দুঃখ জানাইলে কিরণ তাহা ঘুচাইতে সাধ্য-মত প্রয়াস পায়। তবে উৎপাতও যে না ঘটে, এমন নয়। থিয়েটারে ঢুকিবার পর সেখানে ম্যানেজার হইতে ছোট একটরটা অবধি তার

ভালবাসার কাঙাল হইয়া পায়ের কাছে কতবার নতজানু হইয়া পড়িয়াছে! কঠিন দৃষ্টি আর তীব্র ভৎসনায় তাদের সে সাফ বুঝাইয়া দিয়াছে, এ শক্ত কাঠ, এখানে রসের আশায় হাত পাতিলে কোন দিন সে আশা মিটিবার সম্ভাবনাও নাই, কেবলি দুঃখ পাওয়া সার হইবে। কত তরুণ আসিয়া ভিখারীর সুরে বলিয়াছে,—একটু ভালবাসা দাও, কিরণ—!

কিরণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, পুরুষ মানুষ ভালবাসার ধারও ধারে না, আর পুরুষমানুষকে সে চিরদিন ঘৃণা করে। তাদের ভালবাসার কথা মনে হইলে তার সমস্ত গা ঘৃণায় ভরিয়া ওঠে! একটা পথের কুকুরকেও সে ভালবাসিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরুষ মানুষ?…কুকুরের অধম, ভণ্ড, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ… !…

কিরণ বলিল,—আজ এই অবধি থাক্—আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে। সে সব কথা মনে হলে আজো আমার বুকের মধ্যে রক্ত যেন নেচে ওঠে।

লক্ষ্মী বলিল,—থাক্ দিদি। তোমার কথা শুনে আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি, এত ঝড় তোমার মাথার ওপর দিয়ে গেছে—আর তুমি এমন হাসি-মুখে আছ!

কিরণ বলিল,— কি করব বোন্! যা গেছে তা তো গেছেই, তার জন্ম হা-হুতাশ করে ফল কি! বরং তা থেকে যা শিক্ষা হয়েছে, সেটুকু মাথায় রেখে যা বাকী আছে, সেইটুকুর মধ্যে যাতে বিষের ছোঁয়াচ না লাগে, বাঁচিয়ে চলাই ভালো নয় কি!

লক্ষ্মী বলিল,—আমার কি মনে হচ্ছে, জানো দিদি?

কিরণ বলিল,—কি?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন,—তাঁরা কেমন আছেন,—তাঁদের দেখা দাও…

কিরণ চুপ করিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াইবার উপায় যে নেই, ভাই। তাঁদের দোরে সমাজ কড়া পাহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমায় সেধারের কানাচে দেখতে পেলে সে অমনি তার প্রচণ্ড লাঠি আমার গরিব বাপ-মার মাথায় বসিয়ে দেবে!…তারপর একটু হাসিয়া আবার বলিল,—তাছাড়া বাপ আমার এমন তেজী যে অনাহারে পরের দোরে ভিক্ষাও যদি করতে হয় তা করবেন, তবু আমার কাছে সে কষ্ট কখনো জানাতে আসবেন না! তাই ভাবি, বোন, কি বরাত আমাদের, এ বাঙলা দেশে মেয়েমানুষের! একটা ভুল, ভুল বৈ কি—দৈবাৎ যদি করে ফেলি তো তার যত বড় প্রায়শ্চিত্তই করতে চাই না—সে ভুলের মার্জ্জনাও নেই, আমাদের সমাজে!

কিরণের দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিতেছিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ উদাসভাবে চাহিয়া থাকিবার পর কিরণ কহিল,—ভাবচি, এই তো একটা মস্ত কাজ হাতে এসেছে। তোমায় যদি তোমার স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারি, তাতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না! সতী-সাধ্বী তুমি, তোমার সুখের ঘরে যদি তোমায় বসিয়ে দিতে পারি তোমার স্বামীর পাশে, তোমার মেয়ের পাশে…

বলিতে বলিতে কিরণের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এক ফুলে-ভরা কুঞ্জ! সেই কুঞ্জে ছায়া-করা গাছের তলায় বেদীর উপর বসিয়া লক্ষ্মী একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে তার হৃদয়-দেবতার জন্য… মুখে উৎকণ্ঠার ভাব—আশার রঙীন ছাপটুকু তবু লাগিয়া আছে!

তারপর রঘুনাথ আসিল মেয়ের হাত ধরিয়া! দুইজনের চোখে-চোখে মিলিল। কিরণ দুইজনের হাতে হাতে মিলাইয়া দিল। লক্ষ্মীর হাতে গাঁথা মালা স্বামীকে মেয়েকে কি নিবিড় ডোরে বাঁধিয়া ফেলিল! অমনি ওদিকে আকাশ হইতে ঝর-ঝর পুষ্পবৃষ্টি হইল! এ দৃশ্যের উজ্জ্বলতায় তার মনের মধ্যটা অবধি আলোয় আলো হইয়া গেল— দুই চোখে তার দীপ্তি প্রতিবিম্বিত হইল। লক্ষ্মী তখনো তেমনি মূক নির্ব্বাক দৃষ্টিতে কিরণের পানে চাহিয়া।

হঠাৎ কিরণ লক্ষ্মীকে বুকের কাছে টানিয়া তার মুখে চুম্বন করিল। আদরে সোহাগে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া বলিল,—সতী-লক্ষ্মী বোনটি আমার, তোমার পায়ের ধূলায় আমার মন পরিষ্কার করে দাও…বলিয়া তীব্র উচ্ছ্বাসের ভরে সে একেবারে লক্ষ্মীর পায়ে হাত দিয়া সে-হাত নিজের মাথায় ছোঁয়াইল।

লক্ষ্মী তার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল,—ও কি কর দিদি! আমি তোমার ছোট বোন যে—ওতে আমার অকল্যাণ হবে!

—না, না, না,—কিরণ অধীর উচ্ছ্বাসে বলিল,—না, বয়সের উপরেও যার আসন চিরদিন, নারীর মন, নারীর দেহ—তা যে কি উঁচুতে রেখেচো এত বিপদের মাঝেও,সে তুমি বুঝচ না তো! এ যে বড় পবিত্র জিনিষ ভাই,—এই নারীর মন! কারো ছোঁয়াচ লাগাতে নেই এতে— বাহিরে নয়, চিন্তায়ও নয়!…একে তুমি নির্ম্মল রেখেছ…তোমার ঐ দীনতা ভেদ করে কি মহিমা জাগিয়ে রেখেছ—

কিরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী কুণ্ঠিত হইয়া রহিল! তাকে লইয়া এ কি ছেলেমান্ষী কিরণের! সে বলিল,—তোমার কোন দোষ নেই, দিদি। তুমি যে কিছুই পাওনি। যার সঙ্গে বিয়ে

হলো, তাঁকে মনের মধ্যে বরণ করে নেবার সময় হলো কৈ !...তার পর যাকে মনের আসনে দেবতা করে বসালে, সে যদি ছলনা করে চলে যায়, তাতে তোমার দোষ কি !...তাকেই তো তুমি তোমার এক, তোমার সর্ব্বস্ব বুঝেছিলে, তাই তো তাকে নারীর মনের আসনে বসিয়েছিলে আদর করে ! তবে...?

হঠাৎ এত বড় কথাগুলা তার মুখ দিয়া বাহির হইতে লক্ষ্মী নিজেই অবাক হইয়া গেল। এ-সব কথা এমন ভাবেও যে তার মুখে ফুটিতে পারে, এ তার কোনদিনই মনে হয় নাই। অমনি তার মনে হইল, ঘর-ছাড়া এই বিপদের মাঝে তার মন এতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে যে সে অতি-ছোট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরের অনেক-খানিকে আমল দিবার অধিকার পাইয়াছে !

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না ; দাসী আসিয়া খপর দিল, ভুলো পলাশডাঙ্গায় যাইবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে—কোন চিঠি যদি দিবার থাকে তো দাও।

কিরণ তখন লক্ষ্মীকে লইয়া চিঠি লেখাইতে বসিল। পাঁচখানা ছিঁড়িয়া ছয়ের খানা এক রকম পছন্দ-সই হইল। কিরণের কথায় লক্ষ্মী লিখিল,—

শ্রীচরণেষু—

নানা বিপদ কাটাইয়া এখানে দিদির আশ্রয়ে পৌছিয়াছি। চিঠি পাইয়া তুমি এই লোকের সঙ্গে মন্টিকে লইয়া আসিবে। দেখা হইলে সব কথা বলিব। আমার জন্ত ভাবিও না। ইতি

তোমার চরণাশ্রিতা লক্ষ্মী।

তারপর চিঠির তলায় কিরণ তার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিল।

প্রেয়সী

লেখা হইলে খামে রঘুনাথের নাম লিখিয়া ভুলো-ভৃত্যকে লক্ষ্মী সাধ্যমত গ্রামের ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে কিরণ তাকে বলিল,—তুই একখানা ট্যাক্সি নিয়েই যা। পথে লোককে জিজ্ঞাসা করলে গাঁয়ের খোঁজ পাবি। তোর ছোটদিদিমণি পায়ে হেঁটে এত পথ আসতে পেরেছে যখন, তখন গাঁয়ের খোঁজ পাওয়া শক্ত হবে না।

ভুলো দরদী ভৃত্য, বিশ্বাসী; এবং পশ্চিমী হইলেও বেকুব নয়। সে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। কিরণ বলিল,—এসো বোন্, আমায় একটু লেখাপড়া করতে হবে এখন। থিয়েটার আছে—যেটা সাজতে হবে, সেটা একবার দেখে-শুনে নি।

কিরণ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। এইটা তার লেখাপড়া করিবার ঘর। এইখানেই সে তার ভূমিকার কায়দা-কানুন বুঝিয়া শিক্ষা করে। ঘরে প্রকাণ্ড একখানা আয়না; তাছাড়া টেবিল, চেয়ার, একটা কৌচ এবং তক্তাপোষও আছে। কিরণ আসিয়া ঘরের দ্বার ভেজাইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল, আর লক্ষ্মী তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভুলো ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বাড়ী আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আর পাড়ার লোক বলিল, রঘুনাথবাবু ছোট মেয়েটিকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, সে সন্ধান কেহই দিতে পারিল না।

শুনিয়া লক্ষ্মীর মাথা ঘুরিয়া গেল। উপায়…? তার চোখের সামনে যে-পৃথিবী একটু আগেই বেশ শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া অপূর্ব্ব রঙে রাঙাইয়া উঠিতেছিল, সেটা আবার সহসা তার রঙ বদলাইয়া ভীষণ কালো মূর্ত্তি ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে সুরু করিয়া দিল! দুই চোখে আঁধার ভরিয়া সে ডাকিল,—দিদি…

শাখা—১ নং বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কিরণ বলিল,—ভয় নেই, বোন্‌, ভেবো না। তাঁকে পাবেই। খপরের কাগজে আমরা ছাপিয়ে দেব যে তুমি এখানে আছ! তোমার সিঁথির সিঁদুরের জোর কি কম! ওরি জোরে তাঁকে আমরা আনবই। যোদ্ধা তুমি অমন মুষড়ে থেকো না—বুক বাঁধো! সতী-লক্ষ্মীর এয়োতির জোর সামান্য নয়।

এ কথাগুলা তাড়িত-প্রবাহের মত লক্ষ্মীর শিরায় শিরায় বহিয়া গেল। লক্ষ্মী গুম্‌ হইয়া রহিল। জোর করিয়া মনকে সে স্থির করিল, মনকে বলিল, ভয় নাই, তাঁকে পাইব! কিন্তু খপরের কাগজ! তাহাতে ছাপা হইবে এত-বড় লজ্জার কথা! না, না! সে বলিল,—খপরের কাগজে আর কিছু লেখে না।...কিরণ বলিল,—তাই হবে।

— ১৩ —

রঘুনাথ মন্টাকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়াই যে কত পথ অতিক্রম করিল, তার ঠিকানা নাই। শেষে হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। মন্টী ক্ষুধায় কাতর হইলে রঘুনাথ দুই চোখে আঁধার দেখিল। মন্টী আর চলিতে পারিতেছিল না। পথের ধারে গাছতলায় সে শুইয়া পড়িল। রঘুনাথ বসিয়া তার পানে চাহিল। সে ভাবিতেছিল, মন্টী যদি মরিয়া যায়?...বেশ হয়! তারও শৃঙ্খল কাটে! এ অনিশ্চিতের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ানোরও অবসান হয়! সেও তাহা হইলে মন্টীর পিছনে তার অনুসরণ করে!...

শীর্ণ কণ্ঠে মন্টী ডাকিল,—বাবা...

রঘুনাথ সস্নেহে কহিল,—কেন মা?

মন্টী কহিল,—বড্ড খিদে পেয়েছে বাবা।

রঘুনাথ কোন জবাব দিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ চোখে লক্ষীর কাতর মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

সেদিন কি একটা যোগ ছিল। দলে দলে পল্লী-নারীরা স্নানের বেশে পথে চলিয়াছিল। রঘুনাথ হঠাৎ কি মনে করিয়া রমণীদের সাম্নে দাঁড়াইল, ডাকিল—মা…

একজন বর্ষীয়সী রমণী তার পানে চাহিলেন। রঘুনাথ অতি-কষ্টে নিবেদন করিল যে দারুণ বিপদে তারা ঘর-ছাড়া; মেয়েটা ক্ষুধায় মরিয়া যাইতে বসিয়াছে, হাতে তার পয়সা নাই। যদি দয়া করিয়া…বর্ষীয়সী গাছতলায় লক্ষীর পানে চাহিলেন। আঁচলে কয়টা পয়সা ছিল, রঘুনাথের হাতে দিয়া বলিলেন,—এই নাও বাবা…

একজন তরুণী ঘোমটার আড়ালে বর্ষীয়সীকে কি বলিল। শুনিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন,—কিছু কিনে ওকে খাওয়াও। তারপর আমরা এই পথেই তো ফিরবো চান করে। আমাদের সঙ্গে এসো তখন—মেয়ের মুখে ভাতও একমুঠো তাহলে দেওয়া হবে। হাতে তো পয়সা আর নেই…এতে কি হবে বাবা দু'জনের?

রঘুনাথের চোখে জল আসিল। হায়রে, সে আজ পথের ভিখারী! এ'ও তার অদৃষ্টে ছিল!…পরক্ষণেই সে ভাবিল, দেখা যাক্, এর পর অদৃষ্টে আরো কি আছে! অদৃষ্টের স্রোতেই সে গা ভাসাইয়া দিবে। তার পর লক্ষীর দেখা যদি মেলে কোনদিন, সেদিন তার কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া বলিতে পারিবে, ওগো প্রেয়সী, ঐশ্বর্য্যে তোমায় মুড়িয়া দিতে পারি নাই, প্রাচুর্য্যের সুখে তোমায় কোনদিন সুখী করিতে পারি নাই, তবু তোমার প্রেমে ভিখারী সাজিয়াছি… লক্ষী, প্রাণের প্রেয়সী আমার…

কিন্তু লক্ষ্মীকে যে পাওয়া যাইবেই, তার কি আশা আছে…!

মণ্টী ডাকিল,—বাবা—

রঘুনাথের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—তুমি একটু শুয়ে থাকো, মা। আমি খাবার কিনে আনি। বলিয়া সে উঠিল; এবং খানিকটা আগাইয়া গিয়া একটা খাবারের দোকান দেখিল। খাবার কিনিয়া মণ্টীর কাছে রাখিয়া সে বলিল,—খাও মা—

মণ্টী বলিল,—তুমি খাও, তবে আমি খাবো।

আবার সেই কথা! ওরে এ কতটুকু…! তবু তাকে খাইতে হইল। মণ্টী না হইলে খাইবে না! খাওয়া শেষ করিয়া রঘুনাথ সেইখানেই বসিয়া রহিল। সেই মমতাময়ী যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁর সে কথা ঠেলা ঠিক হইবে না। তাঁর মমতার তাহাতে অপমান হইবে!

স্নান সারিয়া তাঁরা আবার এই পথেই আসিলেন। রঘুনাথকে বলিলেন,—এসো বাবা—

রঘুনাথ মণ্টীকে লইয়া তাঁদের অনুসরণ করিল।

একটা কোঠা বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধ—এককালে ভালো চাকরি করিতেন, এখন পেন্সন পাইয়া বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইল। রঘুনাথও তাঁর মমতায় গলিয়া নিজের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন্।

রঘুনাথ বলিল,—বড্ড খারাপ দেখাবে। সমস্ত দেশের বুকে এ কথা একেবারে—

শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—একটু অন্য রকমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্ তবে…

রঘুনাথ বলিল,—না, থাক।

তার মনে হইল, যদি লক্ষ্মীকে সত্যই কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এত বড় অপমান, এত বড় লজ্জার উপর এ ব্যাপারটা তাকে একেবারে কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিবে! তাছাড়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া সে কাগজ দেখিবে! দেখিলেও সে অবলা নারী...ঘরের বাহিরে যে-মস্ত জগৎ, তার কাছে তা একেবারে অচেনা! কেমন করিয়া সে তার জবাব দিবে, কেমন করিয়াই বা আসিয়া তার কাছে উপস্থিত হইবে!...তার কোন সম্ভাবনা নাই! মাঝে হইতে একটা ঘৃণিত কুৎসার পাঁকে রঘুনাথ তাহাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে!

কাজেই রঘুনাথ এ কথায় রাজী হইল না।

আহারাদির পর সে আবার বাহির হইবার জন্ত উঠিল। কর্তা বলিলেন,—একটু জিরিয়ে নিন—পথে বেরুতে হবে, জানি, তবু...

না। রঘুনাথ ভাবিল, বাহিরে থাকাই চাই এখন। যদি পথে দেখা মেলে! এখানে এই প্রাচীরে-ঘেরা বদ্ধ বাড়ীর মাঝে...সে কথা ভাবিতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে!

থাকা হইল না। রঘুনাথ মতিকে লইয়া আবার পথে বাহির হইল। বিধাতা তার সুখের ঘর ভাঙিয়া আজ যদি তাকে পথের পথিকই করিয়াছেন, তবে সে সেই পথকেই সম্বল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিবে! লক্ষ্মীকে যদি কোনদিন পাওয়া যায়, তবেই আবার ঘরের কথা ভাবিবে, নহিলে এই পথই তার সার।

— ১৩ —

এমনি পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে নির্জ্জন তরু-বীথি ছাড়িয়া একেবারে সুপ্রশস্ত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। এ এক নূতন রাজ্য! এখানে লোক শুধু ছুটিয়াছে, অধীর আগ্রহে কিসের পিছনে, কে জানে! এ পথে কেহ একদণ্ড দাঁড়ায় না,—চলিয়াছে, কেবলি চলিয়াছে! পথের পাশে তৃষিত চোখে কাতর মুখে কে দাঁড়াইয়া আছে, তার পানে ফিরিয়া দেখিতে কাহারো আগ্রহ জাগে না, ফিরিয়া চাহিবার সময়ও নাই! এ কি ব্যস্ত চঞ্চল ভাব—চারিদিকে! এই লোকের মেলায়, এই ইট-কাঠ-পাথরে মোড়া সহরের বুকে সে আসিয়াছে, তার লক্ষ্মীর খোঁজে! এ বিষম হট্টগোলে কোথায় পড়িয়া আছে সে বেচারী তার সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সরম আর কুণ্ঠা লইয়া, কোন্ নিরালা কোণে…!

এখানে তার লক্ষ্মীর খোঁজ পাওয়া… এ যে আকাশে ফুল ফুটাইবার দুরাশা।

গাড়ীর পর গাড়ী, লোকের পর লোক—কি ভিড়! এ ভিড় দেখিয়া মন্টী রঘুনাথের হাত চাপিয়া ধরিল; তার বড় ভয় হইতেছিল, যদি তার হাত ছিটকাইয়া সে দূরে সরিয়া পড়ে! রঘুনাথও ভয় পাইল, এ ভিড়ে তার মন্টিকে ঠিক পাশটিতে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে তো!

তারপরে সুরু হইল পাগলের মত নিরুদ্দেশ ঘোরা-ফেরা! কখনো একটা আশার খেই ধরিয়া সে ছোটে গঙ্গার তীরে…আবার কখনো বা ঘুরিয়া বেড়ায় এ পথে ও পথে—নানা পথে! এই লোক-জনের

ভিড়ে এত লোক চলিয়াছে যে তার আর সংখ্যা হয় না! ইহাদের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারে না, তার লক্ষ্মীকে কোথাও দেখিয়াছে কি না!

এই জন-তরঙ্গে আশার মাত্রা সহসা বাড়িয়া প্রাণটায় এমনি আবেগ আর উৎসাহ জাগাইয়া তোলে যে রঘুনাথের হুঁশ থাকে না, মণ্টী তার সঙ্গে আছে...আর নিজের না হোক, মণ্টী তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যায় নাই! কেবলি মনে হয়, এই ভিড়ে তাকে পাইবই... ঐ না, ঐ ঘোমটা-মুখে নারীর দল স্নানে নামিয়াছে, উহার মধ্যে ঐ লাল সাড়ী পরিয়া—ও লক্ষ্মী···না?···সে আগাইয়া যায়...কিন্তু হায়রে, কল্পনা শুধু ছলনায় তাহাকে ঘুরাইয়া মারে! সবই মিছা হয়!

দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে মুস্কিল বাধিল এই যে এত ভিড় থাকিলে কি হয়, ভিক্ষা এখানে মেলে না! তার উপর রাত্রিটাও যে কোথাও পথে পড়িয়া কাটাইবে, তাতেও মুস্কিল। পুলিশ এখানে চোরের পিছনে যত না ছুটুক, নিরাশ্রয় গৃহ-হীন বেচারাকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে বীরদর্পে লাঠি তুলিয়া তার পিছনে ধাওয়া করিয়া তাকে খেদাইয়া দেয়। ঘর তো নাইই, এখানে পথও পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যায়!

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটিতে চলিল। রঘুনাথ গঙ্গার ঘাটে এক ব্রাহ্মণের কাছে আশ্রয় লইল। সে বেচারা কিছুদিন পূর্ব্বে একটিমাত্র মেয়েকে হারাইয়া তার বিগ্রহের মূর্ত্তিটিকেই আঁকড়িয়া পড়িয়াছিল। মণ্টিকে দেখিবামাত্র তার প্রাণে এমন মায়া হইল যে সে আর তাদের ছাড়িতে চায় না। রঘুনাথ তার মন্দিরে শুইয়া

দুঃখের কাহিনী তাহাকে খুলিয়া বলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাকো, তাঁর অদেয় কি আছে!

রঘুনাথের মন এ সান্ত্বনা গ্রহণ করিতে পারিল না। এই তো এক মাস ধরিয়া ঠাকুরকে সে প্রাণপণে ডাকিয়া আসিয়াছে, ঠাকুর তো কোন সাড়াই দিলেন না। রঘুনাথ সহসা ভাবিল, এর চেয়ে যদি দেশের সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে হয়তো বা এতদিনে কোন হদিশ মিলিত। সে ব্রাহ্মণকে জবাব দিল,—তা কৈ হয়, ভাই? এই তো তুমি ঠাকুরকে ধরে পড়ে আছ অথচ তোমার শেষ সম্বলটুকুও তিনি ছিনিয়ে নিলেন!

ব্রাহ্মণ বলিল—সময় সময় মনে হয় এ কথা।...কিন্তু আবার ভাবি, মেয়েটার ভাবনায় ভারী বিব্রত থাকতুম। কোনো কূলে কেউ নেই, শুধু ঐটুকুই ছিল। যদি ওটার বিয়ে দেবার আগে মরে যাই, তাহলে মেয়েটার কি হবে! কার কাছে যাবে, কে দেখবে ...এমনি ভাবনায় পাগল হব, এমনও মনে হতো!...ব্রাহ্মণ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—তাই ঠাকুর ভাবনার বোঝা সরিয়ে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করে দিলেন।

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই সরল ব্রাহ্মণ অত-বড় শোকের মধ্যেও কি সান্ত্বনারই না সৃষ্টি করিয়াছে! বুকটার মধ্যে শোকের পাথার বলিলেও চলে, কিন্তু বাহিরে তার এতটুকু চিহ্ন নাই! চকিতে অমনি এত বড় সহরখানা তার চোখের সামনে হইতে তার সমস্ত হট্টগোল বিলাস আর ঐশ্বর্য্য-সমেত কোথায় সরিয়া গেল, শুধু জাগিয়া রহিল এই গঙ্গার তীরের এই ছোট্ট ভাঙা মন্দিরে ঐ ছোট্ট বিগ্রহটুকুকে লইয়া ধৈর্য্যের এক বিশাল মহিমা!

ব্রাহ্মণ বলিল,—মিছে ভাবা, ভাই। যদি পাবার হয়, তাঁকে পাবেই। আর কি চেষ্টাই বা করবে, বল! তার চেয়ে আমার এখানেই থাকো। কাজ-কর্ম্ম করতে চাও, কর—কিন্তু তোমার মেয়ের ভার আমার। আমার রাঙ্গু-মা গেছে, আর এখন পেয়েছি আমার এই নতুন মা, মন্টী-মা।

রঘুনাথ বলিল,—একটা কথা মনে হচ্ছে। মন্টী তোমার কাছে ভালই থাকবে। দু'দিনের জন্যে, ভাবচি, একবার বাড়ীর দিকে ঘুরে আসি ··

পাছে নিরাশা কোনো দিক দিয়া আঘাত করে, এই ভয়ে রঘুনাথ কারণটা খুলিয়া বলিল না—বলিবার সাহস হইল না।

ব্রাহ্মণ কৃপানাথ প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। সে দৃষ্টির সামনে রঘুনাথ কম্পিত স্বরে বলিয়া ফেলিল—যদি—

কৃপানাথ একটু ভাবিয়া বলিল—বুঝেচি।···কিন্তু কি জানো, একটু শক্ত বুকে যেয়ো—আর যদি নিরাশ হও তো কাবু হয়ো না ভাই। এই মন্টী-মার কথা মনে করে চট্‌পট্ চলে এসো। বুঝচো তো, কত বড় আশা নিয়ে তুমি যাচ্ছ।···

রঘুনাথ বলিল—বুঝি বৈ কি।

•

সেই দিনই অপরাহ্ণে সহসা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। বৈকালের দিকে গঙ্গার বুকে ছেলেদের সাঁতারের বাজি ছিল। বিস্তর লোক আসিয়া নদীর ধারে আসর জমাইয়া দিয়াছিল। রঘুনাথ মন্টীকে লইয়া আসিয়াছিল, একটু বৈচিত্র্যে মন্টীর মনের স্তব্ধ জমাট ভাবটাকে যদি কাটাইতে পারে, সেই প্রত্যাশায়!

শাখা—১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাঁতারের বাজি প্রায় শেষ—সাঁতারাইয়া প্রতিযোগী ছেলেরা বাগবাজারের ঘাট ছাড়াইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ মন্টীকে লইয়া জেটির উপর হইতে ফিরিয়া পথে পড়িতেই চেনা গলায় কে ডাকিল—মাষ্টার মশায়...

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল। এ কি, এ যে যতীশ! মন্টি যতীশকে একেবারে আঁকড়াইয়া ধরিল। রঘুনাথের মুখখানা তাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গেল! মনের মধ্যে আবার সেই কবেকার কথাগুলা জাগিয়া উঠিয়া তাকে একেবারে চাপিয়া ঘিরিয়া ধরিল! যতীশ সে মুখ দেখিয়া বুঝিল, কোন ফল হয় নাই—মাষ্টার মহাশয়ের শুধু পাগল হইতেই বাকী! সে প্রশ্ন করিল,—কোথায় আছেন?

রঘুনাথ বলিল,—ঐ গঙ্গার ঘাটে পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে। দেখবে এসো।

চলিতে চলিতেই যতীশ বলিল—আপনাকে এত খুঁজেচি। মধ্যে একদিন পলাশডাঙ্গায় গেছলুম—ওধারে এমন কিছু খপরও পাইনি...

রঘুনাথ চুপ করিয়া রহিল। যতীশ বলিল,—আমাদের ওখানে চলুন—এখানে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

তখন সকলে কৃপানাথের ঘরের সামনে আসিয়াছে। রঘুনাথ বলিল,—না বাবা, তোমাদের কথা প্রাণ থাকতে ভুলবো না। তবে লোকালয়ে আর থাকবো না, মনে করেচি!

যতীশ বলিল,—মন্টী...?

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্ম যেটুকু ভাবনা ছিল, তাও আজ কাটল তোমায় দেখে। এই ঘর তো দেখে গেলে—মাঝে মাঝে এসো।

তোমাদের ওখানে বেড়িয়েও আসব'খন।...তার পর যেদিন চলে যাব, তোমাদেরই হাতে সঁপে দিয়ে যাব ওকে—!

যতীশ স্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টিতে রঘুনাথের পানে চাহিয়া রহিল; তার পর বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর বলিল,—মাকে বলবো, শুনে মা কালই আসবেন'খন।

রঘুনাথ বলিল,—কাল থাক্। কাল আমি থাকবো না। দু-দিন পরে তাঁকে এনো।...আর কিছু দুঃখ করো না, বাবা। তোমাদের বাড়ীও যাব বৈ কি মন্টীকে নিয়ে—তবে থাকতে পারবো না সেখানে। মাকে বুঝিয়ে বলো। তিনি দুঃখ না করে যেন আমায় ক্ষমা করেন এজন্য! তুমি এখন মন্টীকে নিয়ে একটু গল্পসল্প কর!

যতীশ তখন মন্টীকে লইয়া গঙ্গার ধারে জেটীতে গিয়া বসিল। সাঁতারের আবার বাজি কি! বাজি তো হাউই, তুবড়ির, এই-সব। এমনি নানা কথায় যতীশকে সে ঘণ্টা-খানেক বিব্রত রাখিল। তার পর সন্ধ্যা হইলে যতীশ উঠিল।

মন্টী বলিল,—আমাদের বামুন-জ্যাঠা কেমন ঠাকুরের আরতি করে,—দেখবে না? এসো, দেখবে এসো! বামুন-জ্যাঠার সঙ্গে ঠাকুর কথা কন্, তা জানো যতীশ-দা? কত লোকের অসুখ হলে বামুন-জ্যাঠার কাছে আসে—বামুন-জ্যাঠা ঠাকুরদের বলে ওষুধ দেন, জানো?

এমনি সব কথায় যতীশ-দার তাক লাগাইয়া সে তাকে ঠাকুরের আরতি দেখাইতে আনিল। আরতির পর ঠাকুরের প্রসাদী দিয়া যতীশদার কাছে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে যতীশদা আবার আসিবে, রোজ আসিবে তাদের দেখিতে এইখানে, আর মাসীমাকেও সঙ্গে আনিবে আরতি দেখাইতে!

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া রঘুনাথ দেশের দিকে যাত্রা করিল। কৃপানাথ তাকে পয়সা দিয়া সাহায্য করিল—রঘুনাথ ট্রেণেই বাহির হইল।

ষ্টেশন হইতে অনেকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। সে পথে লোকের ভিড়। সে পথ ছাড়িয়া রঘুনাথ বন-জঙ্গল ঠেলিয়া চলিল। আশায় মাতিয়া কখনো ঝড়ের বেগে চলে, আবার কল্পনা যখন আশার উপর নৈরাশ্যের পর্দ্দা টানিয়া দেয়, তখন রঘুনাথ পথের মাঝে ঝিমাইয়া পড়ে, গতিও মন্থর হয়। মনে হয়, কেন সাধ করিয়া আবার নূতন করিয়া নৈরাশ্য কিনিতে আসিল সে!

বরাবর আসিয়া…ঐ যে হাটতলার পিছনে ঘুরিয়া ঐ বাঁকা সরু পথ চলিয়া গিয়াছে…বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই পথের দেখা মিলিলে একদিন কি আনন্দে বুক তার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! কি পুলক-সম্ভাবনায় সমস্ত প্রাণে শিহরণ জাগিত! আর আজ…! এ পথে পা দিতে সে এমন কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে কেন?

ঐ ঘর,—পোড়া বাঁশ, পোড়া কাঠ-খুঁটি একটা দারুণ শোক ও নির্ম্মম বিচ্ছেদের পতাকা তুলিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে! আজো তার বিষাদ তেমনি অটুট রহিয়াছে!

এই উঠান, ঐ দাওয়া, তুলসী-মঞ্চের একটু স্মৃতি…হায়, পাখী উড়িয়া গিয়াছে! অবহেলায় ঠেলিয়া রাখা তার শূন্য জীর্ণ খাঁচাখানাই পড়িয়া আছে শুধু!

…কারো চিহ্নও নাই! আর কিসের আশা! লক্ষ্মী এ পৃথিবীতেই নাই, তা আসিবে কি! পাথরের মত ভারী পা দুইটা টানিতে টানিতে রঘুনাথ খিড়কির পথে বাহির হইয়া জঙ্গলে ঢুকিল।

...খানিক বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গ্রামের মুদি বিশ্বম্ভরের সঙ্গে দেখা হইল। বিশ্বম্ভর প্রণাম করিয়া বলিল,—দাদাঠাকুর যে!... তা মা-ঠাকুরুণের খোঁজ পেয়েছেন তো?

রঘুনাথ এ কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। সে বিশ্বম্ভরের পানে চাহিল; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বিশ্বম্ভর এ কথায় ভারী বিস্ময় প্রকাশ করিল। সে বলিল,—বল কি দাদাঠাকুর! তবে যে কলকাতা থেকে মোটরে চড়ে একটি লোক এসেছিল, তোমার খোঁজে, মণ্টু-মার খোঁজে...মা-ঠাকুরুণকে পাওয়া গেছে, তিনিই সে লোককে পাঠিয়েছিলেন.. তাঁর কে বোন আছেন, সেই তাঁর বাড়ী থেকে...

এ-সব কি কথা! লক্ষ্মী আছে! তার বোনের কাছে! ...বোন...! রঘুনাথের পায়ের নীচে মাটী দুলিয়া উঠিল, চোখের সামনে দীপ্ত সূর্য্যের খর আলোর উপর কালো পর্দ্দা পড়িয়া গেল। টলিতে টলিতে সে মাটীতে বসিয়া পড়িল, ওরে বেকুব, ওরে মূর্খ, তুই বড় দর্প করিয়া পথে ঘুরিয়া তার সন্ধান লইতে ছুটিয়াছিলি!...ঘর ছাড়িয়া কেন গেলি রে, তুই কেন গেলি!

বিশ্বম্ভর বলিল,—তা এখানে বসচো কেন! আমার ওখানে চল— মুখ হাত ধুয়ে জিরুবে একটু!

রঘুনাথের চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, সেই ভিড়-ভরা সহরের পথ, বাড়ীর ঠাসা-ঠাসি—তার মাঝে কোথায় কোন্ কোণে তার লক্ষ্মী যে পড়িয়া আছে! তার খোঁজ করা—সে কি সহজ কথা!

বিশ্বম্ভর বলিল,—এসো দাদাঠাকুর!

রঘুনাথ বলিল,...না বিশ্বম্ভর, তুমি যাও। আমি এখনি কলকাতায় চললুম,—বলিয়া সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া একেবারে দ্রুত চলিয়া কতকগুলা গাছের অন্তরালে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

— ১৭ —

কিরণের আশ্রয়ে লক্ষ্মী একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। পলাশ-ডাঙা হইতে লোক ফিরিয়া আসিবার পর কিরণ তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, বাড়ীতে যখন তিনি নাই, তখন নিশ্চয় এখানেই আসিয়াছেন তোমার খোঁজে! এবং তাঁর এই সন্ধান সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কিরণ প্রায়ই লক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতার বড় বড় ঘাটে স্নান করিতে যাইত। কখনো যাইত দক্ষিণেশ্বরে, কখনো কালীঘাটে, আবার কখনো বা নানা মন্দিরে।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে মনের আকুল প্রার্থনা জানাইয়া লক্ষ্মীর চোখ তার প্রার্থিতের দর্শন পাইল না। কিরণ বুঝাইত, আজ আশা মিটিল না, কাল মিটিতে পারে।

থিয়েটারে যেদিন ভালো ভালো অভিনয় হইত, লক্ষ্মীকে সে সঙ্গে লইয়া গিয়া মেয়েদের আসনে বসাইয়া দিত। তার পর অভিনয়-শেষে আবার তাকে সযত্নে বুকের আড়ালে লইয়া বাড়ী ফিরিত। মনটা ভাঙিয়া গেলেও একদিন আবার তাহাকে গড়িয়া তোলা যাইবে, এমনি আশা লইয়া লক্ষ্মী তার দিন কাটাইতে ছিল।

সেদিন মহা-সমারোহে থিয়েটারে নূতন নাটক সীতা-নির্ব্বাসনের

অভিনয় হইবে। সীতা সাজিবে কিরণ। কিরণের নামের জয়-সঙ্গীতে থিয়েটারের মালিক সহরকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিরণ থিয়েটারে যাইবার পূর্ব্বে নিজের ঘরে সীতার ভূমিকা আর একবার দুরস্ত করিয়া লইতেছিল। লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া তার সে অভিনয় দেখিতেছিল। কিরণের পাঠ শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল,—এমন বলচো ভাই দিদি যে আমার দুই চোখে জল ঠেলে ঠেলে আসচে।

কিরণ আসিয়া গম্ভীরভাবে লক্ষ্মীর ললাটে চুম্বন করিল, তাকে বুকের মাঝে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—এসো, দুজনে তৈরী হয়ে নি। একলাটি থাকবে কেন! আর যা দেখলে, এতো কিরণকেই দেখলে—থিয়েটারে সিনের গাছ-পালার মধ্যে যাকে দেখবে, সে কিরণ থাকবে না গো, সে সীতা।

গা ধুইয়া কিরণ সাজ-সজ্জা করিল। লক্ষ্মী একখানি মোটা লাল পাড় সাড়ী পরিয়া একখানা মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া লইল। তারপর একটা ট্যাক্সি আনাইয়া কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া থিয়েটারে যাত্রা করিল।

থিয়েটারের সামনে কি ভিড়—লোকে লোকারণ্য! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! গাড়ী, মোটর, লোক...! সেই ভিড় ঠেলিয়া কিরণের ট্যাক্সি আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল। ঘোমটায় ঢাকা কাপড়ের পুঁটলির মতই জড়োসড়ো লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কিরণ নামিয়া থিয়েটারে ঢুকিল। অধীর দর্শকের দল কিরণকে অপূর্ব্ব কৌতূহলে-ভরা দৃষ্টি লইয়া দেখিল, এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এখনি ষ্টেজে নামিয়া কি ইন্দ্রজালেরই না সৃষ্টি করিবে! কোথায় সরিয়া যাইবে সহরের এই কঠিন বুক, সত্যের এই নির্ম্মম পরশ! তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিবে সেই কোন্ কালের অযোধ্যার রাজপুরী, পথ-ঘাট,

সেই বাল্মীকির শান্ত তপোবন—সে এক স্বপ্নের রাজ্য! ঐ কণ্ঠের স্বরে-সুরে কি কুহকই যে ঝরিয়া পড়িবে...!

এই দর্শকের দলে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল—তার চোখ কিরণের উপর হইতে সরিয়া তার সঙ্গিনীটিকে তীক্ষ্ণভাবে পরখ করিতেছিল। লম্বার কাপড়ের আবরণ ভেদ করিয়া যে মর্মর বাহু-লতা, যে চম্পক-অঙ্গুলি, পদ্ম-তল প্রকাশ পাইতেছিল,—সে যেন বিদ্যুতের শিখা! এমন একটা আভা ঐ বর-অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যার পরশে তার তৃষিত চোখ একেবারে ক্ষুধিত আকুল হইয়া উঠিল—সে লাবণ্যের পরশ পরিপূর্ণভাবে পাইবার জন্য মন তার অধীর উন্মত্ত হইল। এ লোকটি রজনী।

জীবন তার নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল—পুরানো মুখ, পুরানো সঙ্গ একেবারে নির্জীব! থিয়েটারে সে আসিয়াছিল, এখানকার কুহক-স্পর্শে প্রাণটায় একটু বৈচিত্র্যের ঝলক লাগাইতে! কিরণকে দেখিবার তার এক-একবার সাধও হইতেছিল—কিন্তু সে জানে, কিরণ এখন দুর্লভ! তাকে পাওয়া যায় না! অথচ একদিন···

একটু হাসিয়া রজনী ভাবিল, যাক সে কথা!...কিন্তু তার ঐ রূপসী সঙ্গিনী—কে ও?

রজনী ভিতরে গেল; গার্ডকে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, কিরণের সঙ্গে আসিল, ও কে?

গার্ড বলিল, সে শুনিয়াছে, কিরণের কি-রকম বোন্ হয় ও! ভদ্র ঘরের মহিলা; কিরণের ওখানেই থাকে, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আসে, পর্দায় বসিয়া থিয়েটার দেখে, আবার তার সঙ্গে স্বতন্ত্র গাড়ীতে চলিয়া যায়!

শুনিয়া রজনী ভাবিল, একবার সে কিরণের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবে। তবে আজ আর হয় না,—কাল…সন্ধ্যার পরেই—কাল তো কিরণের কোন পার্ট নাই—সে থিয়েটারেও আসিবে না!

রবিবার। সন্ধ্যা হইয়াছে। লক্ষ্মী নিত্যকার মত জানলায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়াছিল। পথে জন-তরঙ্গ চলিয়াছে—তাই সে একটি-একটি করিয়া গণিতেছিল; আর ঠাকুরকে মিনতি জানাইতেছিল, এই পথে তাঁকে আনো, ঠাকুর…আর যে সহ্য হয় না। কিরণ তখন গিয়াছিল গা ধুইতে। দুইজন কালীঘাটে আরতি দেখিয়া আসিবে, কথা ছিল।

রাস্তায় গ্যাস্ জ্বলিতেছে। রাত্রের ফিরিওয়ালারা বিচিত্র স্বর তুলিয়া তাদের ফেরির পশরা লইয়া পথে বাহির হইয়াছে—কেহ হাঁকিতেছে, 'বেল ফুল,' কেহ বা কুলপী বরফের হাঁড়ি মাথায় চাপাইয়াছে! এ সবগুলার উপর দিয়া ভাসিয়া লক্ষ্মীর মন সেই তার পল্লীর ঘরখানির আশে-পাশে বিচরণ করিতেছিল। সেই জনহীন পথ, পুকুর-ঘাট, সেই আঁধারে-ঢাকা তুলসীমঞ্চ…সে কি স্বর্গই না ছিল তার…!

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা মত্ত স্বর আসিল,—কিরণ-বিবি…

চমকিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া দেখে…এ কি…এ যে সে-ই! যে তাকে তার স্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া আজ এই পথে বসাইয়াছে!…এ সেই…রজনী।

দুইজনে চোখোচোখি হইল। অমনি আগন্তুক একলাফে একেবারে তার সামনে আসিয়া হাজির হইল। বিভোর দৃষ্টি তার পানে তুলিয়া হাসিয়া সে বলিল,—তুমি! আমার খাঁচার পাখী, তুমি এসে কিরণের

খাঁচায় ঢুকেচো! বলিয়াই সে লক্ষ্মীকে ধরিবার জন্ত দুই হাত বাড়াইল।

লক্ষ্মী ছুটিয়া পলাইতেছিল, রজনী তাকে ধরিয়া ফেলিল; আবেগ-জড়িত স্বরে বলিল,—তুমি যে একেবারে আমায় মুষড়ে রেখেছ প্রেয়সী! তোমায় কম খুঁজেচি!…ভাগ্যে কাল থিয়েটারে গেছলুম…

লক্ষ্মী আবার এই দৈত্যের কবলে পড়িয়া প্রমাদ গণিল; ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল, কিরণ! কিরণের কেশের রাশি এলায়িত, দুই চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে কি এক দীপ্তি! সে এক অপরূপ মূর্ত্তি!

কিরণ আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া বলিল,—এ কি! তুমি…?

রজনী হাসিয়া বলিল,—এ যে আমার ধন, কিরণ-বিবি, একে তুমি পেলে কোথায়?

কিরণ বলিল,—তুমিই…?

কথাটা বলিবার সময় রজনীর হাতের বাঁধন একটু শিথিল হইয়াছিল—তারি ফাঁকে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া কিরণের পিছনে দাঁড়াইল; আসিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল,—এই সে, দিদি…!

কিরণ কহিল,—এ-ই…? তার পর রজনীর পানে চাহিয়া বলিল,—তোমার এ রাক্ষুসে ক্ষিদে কি সবাইকে গ্রাস করবে? আমার সর্ব্বনাশ করেও তোমার তৃপ্তি হয়নি? ভদ্র ঘরের সতী-স্ত্রী, স্বামীর প্রেমে স্বর্গ তৈরী করে বসেছিল, তাকে সে স্বর্গ থেকে হিঁচড়ে টেনে বার করে পথে দাঁড় করিয়েছ! আশ্চর্য্য, তোমার মাথায় বাজ পড়ে না! ভগবান কি ঘুমিয়ে আছেন!

হাসিয়া রজনী বলিল,—তোমার সব সময় এ্যাকটিং !...তা ঘরে কেন, ষ্টেজে করো, ঢুশো তারিফ পাবে !

দুই চোখে আগুনের হল্‌কা ফুটাইয়া ভৎ‍ৰ্সনার স্বরে কিরণ বলিল,—আবার আমার ঘরেই চোরের মত ঢুকেচ !...আর ঢুকে আমারি মুখের উপর ঐ মুখ নিয়ে বিদ্রূপ করচ, ব্যঙ্গ করচ !. তুমি ভদ্র বলে পরিচয় দাও ! আমার বাড়ীতে যে চাকর বাসন মাজে, তার জুতো ছোঁবারো যোগ্য নও তুমি !...তোমায় আর কি বলবো ? চলে যাও,...এখনি বেরিয়ে যাও !

রজনী সহসা এ কথায় চমকিয়া উঠিল। তার মুখের উপর এমন কড়া শাসন চালাইতে সাহস করে, একটা কুলটা নারী, সামান্য একজন থিয়েটারের অভিনেত্রী ! বিশেষ, কিরণ—যে একদিন তার হাত ধরিয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছিল !...সে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ বলিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে ! চলে যাও, নাহলে আমার চাকরকে ডাকবো, সে তোমার হাত ধরে বাড়ীর বাইরে তোমায় রেখে আসবে...

রজনী বলিল,—কি ! এত বড় কথা ! বলিয়া সে কিরণের দিকে আগাইয়া আসিল।

কিরণ হাঁকিল,—ভোলা...

ভোলা ভৃত্য নিকটেই ছিল। ঘরের মধ্যে ঝাঁঝালো কথা শুনিয়া সে আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। কিরণের আহ্বানে ঘরের মধ্যে আসিলে কিরণ বলিল,—এই ছোট লোকটার হাত ধরে বাড়ীর বার করে দে...

ভোলা আসিয়া রজনীর হাত ধরিল, বলিল,—কেন বাবু ঝামেলা কর…বাহার যাও…

ঝট্‌কানি দিয়া ভোলার হাত ছাড়াইয়া প্রচণ্ড রোষে রজনী হাতের লাঠি তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের আলমারিতে লাঠি লাগিল এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে তার দুখানা কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি একটা রক্তের তৃষ্ণায় রজনীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে দিক্‌-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া লাঠির ঘায়ে আলমারিটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল—তারপর হাতের কাছে পানের ডিপা পাইয়া সেটা ছুড়িল কিরণের পানে। কিরণের গায়ে ডিপাটা না লাগিয়া লাগিল গিয়া টেবিলে-রক্ষিত একটা পোর্শিলেনের বড় প্রতিমূর্ত্তির গায়ে। মূর্ত্তিটা ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল।

কিরণ তীব্র স্বরে গর্জ্জাইয়া উঠিল—এখানে এসেচ গুণ্ডামি করতে! বদমায়েস, মাতাল, ইতর…বলিয়া লক্ষ্মীকে সে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কোণ হইতে একটা চাবুক তুলিয়া লইল; কহিল,—বেরোও, বেরোও, বলচি,—না হলে এখনি এই চাবুকের ঘায়ে তোমায় ঢিট্ করে দেব।

রজনী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল,—রণ-সাজে সেজেছো! কিন্তু এটা থিয়েটার নয়, বিবি…

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিরণের হাতের চাবুক শপাৎ করিয়া পড়িল রজনীর মুখে। তখন প্রহার-ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত রজনী কিরণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভোলা চাকর তখনই রজনীকে টানিয়া ছাড়াইতে গেল—কিন্তু সে তখন প্রচণ্ড বিক্রমে কিরণের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

রীতিমত একটা ধবস্তাধবস্তি চলিল,—মাতাল হইলেও রজনীকে হঠানো সহজ হইল না। এমন সময়ে দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিল। আলমারী ভাঙ্গিতে দেখিয়া সদু দাসী ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছিল—মোড়ের কাছেই ছিল দুইজন পাহারওয়ালা। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া পানওয়ালীর সঙ্গে তারা খোসগল্প করিতেছিল। সদু গিয়া তাদের খবর দিতেই তারা ছুটিয়া আসিয়াছে। এ-বাড়ী হইতে বখশিস প্রায়ই মেলে, তাই তারা খাতিরও করে!

কনষ্টেবলরা আসিয়া রজনীর দুই হাত ধরিয়া তাকে ছাড়াইল। কিরণের মুখ তখন নীল হইয়া গিয়াছে। রজনী ফুঁশিতেছিল। পুলিস বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরিয়া তারি গায়ের চাদর টানিয়া রজনীর হাত দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। কিরণ ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

কিরণ বলিল,—এই গুণ্ডা আমার ঘরে ঢুকে আমায় খুন করতে এসেছিল। আমার জিনিষ-পত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেছে। একে ধরে থানায় নিয়ে যাও!

পাহারাওয়ালারা কিরণকে সেলাম করিয়া আসামী লইয়া প্রস্থান করিল।

— ১৮ —

যতীশ গিয়া সে-রাত্রে যখন মার কাছে বলিল, রঘুনাথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মা তখন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন মণ্টিকে দেখিবার জন্ত যে সেই রাত্রেই গাড়ী আনাইয়া বাগবাজারে আসিয়া হাজির হইলেন।

যতীশের মা বহু সাধ্য-সাধনা করিলেন, আমার ওখানে চল বাবা—কিন্তু রঘুনাথের এক কথা, আমায় মাপ করবেন মা। মানুষের পুরীতে আর আমার ফেরবার সাধ নেই! এখানে বেশ আছি।

যতীশ বলিল,—কাল এসে আমাদের ওখানে আপনাদের নিয়ে যাব মাষ্টার মশায়। আমরাও বেশী দূরে থাকি না—এই দর্জ্জিপাড়ায়—পাঁচ মিনিটের পথ।

তারপর যতীশ এখানে প্রায়ই আসিতে লাগিল। তার সঙ্গে মন্টী বেড়াইয়া আসিত, গঙ্গার ধার দিয়া অমন কতদূর অবধি!

সেদিন যতীশদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ সারিয়া রঘুনাথ যতীশ আর মন্টী পরেশনাথের মন্দির দেখিতে গিয়াছিল। মন্দির দেখিয়া সেখানে খানিক বসিয়া গল্প করিয়া তারা যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়!

বরাবর সার্কুলার রোড ধরিয়া আসিয়া তারা গ্রে ষ্ট্রীটে পড়িল; গ্রে ষ্ট্রীট ধরিয়া তারা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিল। সেইখানটায় পথ পার হইয়া যেমন ওদিককার ফুটপাথে উঠিবে, হঠাৎ অমনি কোথা হইতে একটা ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল। এবং মন্টী ভ্যাবাচাকা খাইয়া যেমন ছুটিতে যাইবে, অমনি গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া ফুট-পাথের কোলে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল। তার কপাল কাটিয়া ঠোঁট কাটিয়া ঝর-ঝর ধারে রক্ত ঝরিল।

অমনি মজা পাইয়া যত ভিড় আসিয়া জমিল সেই জায়গায়। সকলেই উঁকি মারিয়া দেখিতে চায়, বেশ গল্প করিবার মত ব্যাপার কিছু ঘটিল কি না! ড্রাইভারটা পলাইতেছিল—পাঁচ-সাত জন লোক ঘুষি পাকাইয়া তাহাকে রুখিয়া দাঁড়াইল—কেহ দিল তার গালে

প্রচণ্ড চড়, কেহ দিল এক ঘুষি। মারের চোটে ড্রাইভারের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ছিট্‌কাইয়া কোথায় যে গিয়া পড়িল, তারও মুখে রক্ত ছুটিল।

তখন পুলিশ আসিয়া ধমক দিয়া ভিড় সরাইল—রঘুনাথ আর যতীশ পথের কলের জলে চাদর ভিজাইয়া মন্টীর মুখে-চোখে দিল। পুলিশ আসিয়াই তাদের লইয়া থানায় যাইতে উদ্যত হইল। যতীশ বলিল—তার আগে হাসপাতালে চল। মেয়েটিকে আগে বাঁচানো দরকার।

সেই ট্যাক্সিতে করিয়াই মন্টীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তার ক্ষত ধুইয়া ডাক্তার পটি বাঁধিলেন; এবং প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়া পুলিশের হাতে দিলেন; পুলিশ সেই রিপোর্ট আর জখমী রোগীকে লইয়া বড়তলা থানায় হাজির করিয়া দিল।

থানার সামনে আবার ভিড় আসিয়া ঠেল দিয়া দাঁড়াইল। সকলের চোখেই কৌতূহল, সকলের মুখেই চীৎকার। পথের চলন্ত ট্রাম হইতে যাত্রীর দল থানার পানে চাহিয়া ভাবিল, ব্যাপার কি! এরা সব থানা লুঠ করিতে আসিয়াছে না কি!

মন্টীর কেশ লেখা হইতেছে, এমন সময় গ্রেপ্তারী আসামী রজনীকে লইয়া অপর পুলিশের লোক ভিড় ঠেলিয়া থানায় ঢুকিল।

থানার ঘরে ঢুকিয়া সাম্‌নেই মন্টীকে দেখিয়া রজনী শিহরিয়া উঠিল।

এ কি এ…এ যে তার প্রেয়সীর মুখখানিই ছোট্ট করিয়া কোন্ নিপুণ শিল্পী ছকিয়া রাখিয়াছে! আর…তখনি চোখ পড়িল রঘুনাথের দিকে! এ কি মূর্ত্তি! এ যে বেদনা তার দারুণ আর্ত্ত রূপ ধরিয়া রজনীর সামনে দাঁড়াইয়া! মুখে একরাশ দাড়ি গজাইয়াছে, মাথার চুলগুলা এলোমেলো, দীর্ঘ…তার মনের উপর শপাৎ করিয়া কোথা হইতে তীব্র

চাবুকের ঘা পড়িল,—কে যেন কাণের কাছে চীৎকার করিয়া বলিল, পাষণ্ড, তোর জন্তই আজ এদের এ দশা! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়িল, সেই বনের কোণে পুকুরের ধারে জীর্ণ ঘর, সেই ঘরের তকৃতকে উঠানে এই মেয়েটি নিজের মনে খেলা করিত…

তার পর রজনী চাহিয়া দেখে,এটা থানা! চোর,খুনে, ঠক, বাটপাড়, জালিয়াৎদের যেখানে আটক রাখে—নর-সমাজের আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া পুলিশ যেখানে জড়ো করে! ঐ হাজত-ঘর! পথে চলিতে পথ হইতে সে অমন কতদিন দেখিয়াছে, ঐ ঘরের মধ্যে চিড়িয়াখনায় বদ্ধ জানোয়ারের মতই কোমরে দড়ি-বাঁধা আসামী…লোহার গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। বাহির হইতে তাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঐ খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, তার দানবী হিংসা হইতে অপর মানুষগুলাকে রক্ষা করিবার জন্ত! এই ঘরেই ঐ সব খুনে জালিয়াতের সঙ্গেই তাহাকে এখন পুরিয়া রাখা হইবে…! আর সহরের লোক দূর হইতে দেখিয়া ভাবিবে, এ-ও একটা খুনে, জালিয়াৎ, ঠক, চোর……

রজনী ভাবিল, সেও কি তাদের চেয়ে কম কোনোখানে! সে-ও যে কত নারীর মন ছেঁচিয়া খুন করিয়াছে, প্রেমের কুহকে মজাইয়া কত নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—নারীর নারীত্ব—তাও কি সে চুরি করে নাই!

ভাবিতে ভাবিতে মাথা ঝিম্ ঝিম করিয়া উঠিল—পায়ের তলা হইতে মাটি বুঝি সরিয়া যাইবে এমনি বেগে দুলিয়া উঠিল। রজনী পড়িয়া যাইতেছিল, তার কনষ্টেবল এক ঠেলা দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—এই মাতোয়ালা, খাড়া রহো…

ইন্‌স্পেক্টর বাবু মন্টীর কেশ লিখিয়া তাদের লইয়া তদারকে বাহির হইলেন; বলিয়া গেলেন, এ আসামীকে হাজতে পুরিয়া রাখো, আসিয়া সব কথা শুনিব। অন্য বাবুরা তদারকে বাহির হইয়াছেন, তাঁরও মোটর-কেশের জরুরি তদারক পড়িয়াছে!

রজনীকে তখন হাজত-ঘরে পোরা হইল। বাহিরের ভিড় হইতে দুই-একটা তীব্র মন্তব্য রজনীর কাণে আসিয়া পৌঁছিল। তারা বলিতেছিল,—জানিস্ না? ও ভারী বাবু-লোক, মোটরে চড়ে বেড়ায় যে! থিয়েটারের বক্সেও প্রায়ই নানা মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসে। নাও বাবা, এখন পুলিসের রুলের গুঁতো খাও! একজনের স্বদেশ-প্রেম এমন তীব্র জাগিয়া উঠিল যে আক্ষেপ ও বিদ্রূপের সুরে সে বলিল,—এই সব লোক হলো আমাদের দেশের বড় লোক! এতে আর জাতের উন্নতি হয় কখনো! মাতাল ব্যাটা...

ঘৃণায় লজ্জায় রজনী হাজত-ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

মোটর-কেশের তদারক সারিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবু থানায় ফিরিয়া হাঁকিলেন,—আসামী লে আও।

তখন হাজত-ঘর হইতে রজনীকে বাহিরে আনা হইল। তার কনষ্টেবল আসিয়া বলিল, এই আসামী থ্যাটারের কিরণ-বিবির ঘরে ঢুকিয়া বিবি-লোককে মারিতেছিল, তার ঘরের জিনিষ-পত্রও ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিয়াছে। বিবির দাসী আসিয়া খপর দিয়া তাদের পথ হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়—তারা গিয়াও স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এ সব জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—এখন মজা দেখবেন, চলুন! ছি, ছি,

আপনারা ভদ্দর লোক! কাল কোর্টে চোর-ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে ডকে গিয়ে দাঁড়ালে ভারী পৌরুষ বেরুবে'খন! বীরত্ব দেখাবার আর জায়গা পাননি!

রজনী একেবারে কাঁদিয়া ইন্‌সপেক্টরের পায়ে পড়িল, মিনতির স্বরে বলিল,—আমি কাণ মল্‌চি, এ অপমানের হাত থেকে বাঁচান। এ অপমানের পর আমি আর বাঁচবো না!

ইন্‌স্‌পেক্টর হাসিয়া বলিলেন,—আমাদের হাতে পড়লে অনেক বদমায়েসই একেবারে সত্যপীর হয়ে ধর্ম্মের বক্তৃতা সুরু করে দেয়!

রজনী বলিল,—না মশায়, আমি তাদের দলে এখনো পৌঁছুই নি। অনেক বদমায়েসী করেছি, অনেক পাপ করেচি—তবে পার পেয়ে গেছি,...এই সামান্য ব্যাপারে আমার জ্ঞান হয়েছে...যথার্থ বলচি, আজ এ থানার ঘরে ঢুকে আমি বুঝতে পেরেচি, আমি কোথায় নেমে দাঁড়িয়েছি! দয়া করুন, আমায় একটা chance দিন্ মানুষ হবার—a life's chance.

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—তা আপনি কিরণ বিবিকে বলতে পারেন...তিনি যদি মামলা তুলে নেন তো আমাদের আপত্তি নেই। এটা compoundable case—শুধু trespass বলে লিখি নিচ্ছি!... আপনি জামিন দিতে পারেন?

জামিন! রজনী অকূল পাথারে পড়িল। এই লজ্জার কথা সে কাহার কাছে গিয়া বলিবে এখন! বন্ধু-সমাজে মুখ দেখাইবে কি করিয়া! হাজতের আসামী! সে হতাশভাবে বলিল,—আমার জামিন হবার জন্যে উপস্থিত তো কাকেও দেখ্‌চি নে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন—আচ্ছা, এখন কিরণ বিবির ওখানে তো যাওয়া যাক্‌, তারপরে সে কথা হবে'খন।

বলিয়াই ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু একজন পাহারওয়ালাকে ডাকিলেন, তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য। সে আসিয়া রজনীর কোমরে একটা মোটা দড়ি জড়াইল। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—এই দড়ি-বাঁধা বেশে পথে যেতে পারবেন তো?

রজনী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—তার পর কাল সূর্য্যের মুখ দেখবার জন্য আমায় আর থাকতে হবে না। এ অপমানের পর···

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুটী ভদ্র; তিনি পাহারওয়ালাকে বলিলেন,—একঠো গাড়ী বোলাও।

সে গাড়ী ডাকিলে রজনীকে লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; কনেষ্টবল গিয়া কোচবক্সে চড়িল। তখন গাড়ী চলিল, কিরণের বাড়ীর দিকে।

কিরণ বাড়ী ছিল না। অত-বড় ব্যাপারখানা ঘটিয়া যাইবার পর কিরণের কাছে সমস্ত বাড়ীর হাওয়া এমন বিষাইয়া উঠিয়াছিল যে সে লক্ষ্মীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, এই রজনী—হায় রে, ইহাকে বিশ্বাস করিয়া, ইহার উপর নির্ভর করিয়া সে কি আশার পথে বাহির হইয়াছিল! ঘৃণায় তার মন একেবারে কালো হইয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। রূপালি আলোর ঝর্ণায় স্নান করিয়া সারা সহর যেন হাসিতেছিল। এই আলোর ধারায় কিরণের মন তার সমস্ত দুঃখ মুছিয়া ঝরঝরে হইয়া উঠিল। গাড়ী গিয়া যখন

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিল, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। শান্ত মন্দির, চারিধার শান্ত—এমনি এক মায়ার জাল বিছানো রহিয়াছে যে একটু আগেই যে বিশ্রী কাণ্ডখানা ঘটিয়া গিয়াছিল, তার শেষ চিহ্ন অবধি তার মন হইতে ছিটকাইয়া কোথায় ঝরিয়া পড়িল।

দুইজনে গিয়া ঘাটের কোলে বসিল। নদীতে তখন ভাঁটা পড়িয়াছে। মৃদু উল্লাসে ছোট ছোট ঢেউগুলা তটের কোলে ছুটিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল—ঠিক যেন এক দুঃখে-জমাট পাষাণ বুকের কাছে সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মত! দূরে কে গান গাহিতেছিল—

দিবস-রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি,
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।

গানের কথাগুলি লক্ষ্মীর বুকে এমন করুণ রেশ জাগাইয়া তুলিল যে তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। ওগো, এ যে তার অন্তরের বড় গোপন কথা! কে তুমি, এ কথা কেমন করিয়া জানিলে গো? আমার মন সত্যই যে অতি তৃষিত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—দুই শ্রবণ তার কণ্ঠের স্বরটুকু পাইবার জন্য উন্মুখ অধীর সর্ব্বক্ষণ! কে গো, বলিয়া দাও,—কোথায় সে!

গায়ক গাহিতেছিল,—

জাগরণে তারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন-পাশে—

লক্ষ্মীও তো তাই আকুল থাকে, কখন্ রাত্রি হইবে, চারিদিককার সব কোলাহল মূর্চ্ছিত হইবে! তার মনও অমনি তন্দ্রালোকে গিয়াও প্রবেশ করিবে,—তখন সে আসিবে, তার প্রিয়তম, দুই বাহুর বাঁধনে লক্ষ্মীকে বাঁধিবার জন্য…

গান তখন দুলিয়া দুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,—

এত ভালবাসি, এত যারে চাই
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি!

কৈ, কৈ, কৈ গো, তার ব্যাকুল প্রাণের বাসনা কামনা লক্ষ্মীর প্রিয়তমকে ডাকিয়া আনিতে পারিল না তো!—তবে…তবে?

বুকের কাছটায় এমনি এক নৈরাশ্য জমাট বাঁধিয়া ভারী পাথরের মত ঠেলিয়া আসিল যে তার চাপে লক্ষ্মীর নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; চোখের সামনে চাঁদের আলো সহসা নিবিয়া আসিল। সে কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত হতাশভাবে ঢলিয়া পড়িল। কিরণ ওপারে আলো-আঁধারের অস্পষ্ট ছবির মত গ্রাম-রেখার পানে চাহিয়াছিল। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ঐ যে আলোর কণা দেখা যাইতেছে, লোক-কোলাহলের একটা অস্ফুট গুঞ্জনও ঐ যে জলের বুক বহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে…কিরণ ভাবিতেছিল, ঐ আলোর কণা, ও কোন্ সুখের ঘরের হাসির হীরার কুচি! ভাই-বোন, মা-বাপের স্নেহ-প্রীতিতে ঘেরা সুখের ঘর—ও ঘরে না আছে নৈরাশ্য, না আছে অনুতাপের বেদনা! সে যদি ঐ ঘরে আজ একটু ঠাঁই লইতে পারিত!

এমনি ভাবনার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্মী তার বুকে শ্রান্ত শির এলাইয়া দিতে কিরণের চমক ভাঙ্গিল। সে ডাকিল,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী কাতর চোখে তার পানে চাহিয়া ডাকিল,—দিদি…তার পর চক্ষু মুদিল।

গানটা কিরণের কানেও গিয়াছিল। তার প্রাণের বৃন্তটাকে নাড়া দিয়া গানের সুর তাকে একেবারে শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, হায়রে, তার যে আর আশা করিবার কিছু নাই…সে এই এত-বড় পৃথিবীর বুকে নিতান্ত একা, অসহায়। একটু আশা করিবার শক্তি—তাও দুই পায়ে মাড়াইয়া চুরমার করিয়া দিয়া আসিয়াছে! তার মত দুর্ভাগিনী আর কেহ আছে কি!…কোন কথা না বলিয়া লক্ষ্মীর পানেই সে চাহিয়া রহিল।

গায়ক তখন অন্য গান ধরিয়াছে,—

অলি বার বার ফিরে যায়—
অলি বার বার ফিরে আসে
তবে তো ফুল বিকাশে!

কিরণের মন গানের সুরে এই ধূলা-মাটীর জগৎ ছাড়িয়া কোথায় যে উধাও যাত্রা সুরু করিল…ফুল, ফুল, ফুলে ছাওয়া, আলোয় আলো-করা সে এক কুহককর রাজ্য! হাসির রাশি ফুলের পাপড়ির মতই এ রাজ্যের পথে পথে ছড়ানো!—সেই ফুল আর হাসির রাশির মাঝে কিরণের মন এমনি বিভোর হইয়া পড়িল যে এই মন্দির, এই ঘাট, ঐ নদীর জলে ঢেউয়ের কাণাকাণি, পাশে লক্ষ্মী,—সব একেবারে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল!…

হঠাৎ একটা সুরের হাওয়ায় চমক ভাঙিল !

গায়ক গাহিতেছিল—

আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়-রতন-আশে।

এ কথায় সে একেবারে লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া কহিল,—ঐ শোনো লক্ষ্মী··· আশা ছেড়ো না বোন্, কোনদিন ছেড়ো না। নদীর ঢেউগুলোও, শোনো,ঐ কথাই বলছে···আশা ছেড়ে তবু আশা রাখো,আশা রাখো···

কিরণের বুক হইতে মাথা তুলিয়া লক্ষ্মী ঢেউগুলার পানে উদাস নেত্রে চাহিল...তারো মনে হইল, ঢেউগুলা যেন আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়া ঐ কথাই বলিতেছে—সুরের ঐ কথাটাই যেন চারিদিকে ভাসিয়া ফিরিতেছে ! আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও···কিন্তু এ কি আশা...এ যে দুরাশা, মস্ত বড় দুরাশাকে সে আজ সম্বল করিয়া আবার জগতের বুকে উঠিয়া দাঁড়াইতে চায় !

তারপর দুই জনেই স্তব্ধ বসিয়া রহিল। মাথার উপর নক্ষত্রের সভায় একরাশ নক্ষত্র শুধু স্তম্ভিত বুকে এই দুই নারীর অন্তরের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে ! হায় নারী, হায় অভাগিনী,—এত দুঃখ সহিয়াও তোরা বাঁচিয়া থাকিস্, কি করিয়া ! ছল-ছল চোখে দুইজনের পানে চাহিয়া নক্ষত্রের, দল বুঝি এই কথাটাই কানাকানি করিতেছিল !

কিরণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—চলো ভাই, ঠাকুর প্রণাম করে আসি। এখনি দোর বন্ধ হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীকে লইয়া কিরণ আসিয়া মন্দিরে দাঁড়াইল। ঠাকুরকে দুইজনে প্রণাম করিল। লক্ষ্মী প্রাণের আবেগে উজাড় করিয়া ডাকিল, —আর যে পারি না মা, বুক ভেঙে যাচ্ছে ! দাও মা, তাঁদের এনে

দাও। যদি কায়-মনে স্বামীর পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তাহলে তাঁদের আর দূরে রেখো না, এনে দাও মা! আমি বুক চিরে রক্ত দেব...এই পাহাড়-প্রমাণ দুঃখে ভরা বুক চিরে...যত চাও ..

কিরণ লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—লক্ষ্মী ..

লক্ষ্মী সে আহ্বানে চমকিয়া মুখ তুলিল, বলিল,—ডাকচো দিদি?

কিরণ দীপ্ত চোখে বলিল,—হ্যাঁ। আমি আকুল হয়ে মাকে ডাকছিলুম যে, মা, এই সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল মুছে দাও মা··· তাতে মার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠল—ঠিক বিদ্যুতের রেখা! তবে তাতে ঝাঁজ নেই—এই জ্যোৎস্নার মতই ঠাণ্ডা!...এমন তো কখনো আমি দেখিনি ভাই!

লক্ষ্মী আবেগে কিরণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল,—তোমার কথাই সত্য হোক্ দিদি···

— ১৯ —

বাড়ীতে ফিরিতে দাসী সংবাদ দিল, রজনীকে লইয়া থানার ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তদারকে আসিয়াছিলেন। যাহা ঘটিয়াছিল, তারা তাঁর কাছে সব খুলিয়া বলিয়াছে। তবে কিরণের কথাও পুলিশ শুনিতে চায়। কাল সকালে পুলিসের বাবু আবার আসিবেন। দাসী আরো বলিল, রজনীবাবু আর সে রজনীবাবু নাই। পুলিশের হাতে পড়িয়া তার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। তাহাদের কাছে মিনতি জানাইয়াছে, কিরণ যেন তাকে ক্ষমা করে। সে আরো বলিয়াছে, যে ছোটদিদিমণির স্বামীর সে সন্ধান পাইয়াছে! ছোট-দিদিমণির মেয়েটি না কি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া জখম হইয়াছে···এই কলিকাতাতেই—

এ-সব কি কথা! কিরণ ও লক্ষ্মী দুইজনে চমকিয়া উঠিল; এবং তখনি একখানা গাড়ী ডাকাইয়া দুইজনে ভৃত্যকে লইয়া থানায় ছুটিল।

রজনী তখনো থানায় বসিয়া আছে। ভুলো গিয়া খপর দিল, কিরণ বিবি আসিয়াছেন। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—বেশ, আমি যাচ্ছি।

তিনি উঠিবার পূর্ব্বেই কিরণ আসিয়া থানার ঘরে প্রবেশ করিল।

রজনী তাকে দেখিয়াই বলিল,—আমায় মাপ কর কিরণ। আজকের ঘটনা আমায় নূতন মানুষ করেছে!...এখন আমার জামিন হয়ে কেউ না দাঁড়ালে আমায় ঐ চোর-জালিয়াৎদের সঙ্গে হাজত-ঘরে বাস করতে হবে! আগে তার উপায় কর। তুমি মনে করলেই এ মামলা উঠিয়ে নিতে পারো...যদি ক্ষমা করতে পারো আমার তো সব দিক দিয়েই আমি সুযোগ পাই মানুষ হবার...তারপর রঘুনাথ বাবুর সন্ধানও আমি পেয়েছি...যদি অনুমতি কর তো যে অন্যায় করেছি তার প্রতিকার করবারও সুযোগ হয়!

কিরণ ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর পানে চাহিয়া বলিল,—মামলা আমি উঠিয়ে নিতে চাই। একজন বড় ঘরের ছেলের এ বে-ইজ্জতি...

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। এ সেই রজনী...যার সান্নিধ্য তার সব চেয়ে কাম্য ছিল, একদিন যার অদর্শন তার অসহ্য ঠেকিত...!...যা গিয়াছে, তা একেবারেই গিয়াছে, ফিরিবার নয়, ফিরিবার নয়, ফিরাইতে সে চায়ও না!

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—স্বচ্ছন্দে আপনি মামলা উঠিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তার আগে আপনার জবানবন্দী চাই—অর্থাৎ যা-যা ঘটেছিল—! এর পর আজ রাত্রের মত উনি জামিনে খালাস থাকবেন।

কাল ডেপুটি কমিশনারের কাছে ওঁকে একবার হাজির হতে হবে। আপনি তাঁর কাছে বললে বা উকিল দিয়ে বলালে মামলা মিটবে, উনিও খালাস পাবেন।

কিরণ বলিল,—একজন উকিল তো চাই তাহলে। কিন্তু আমি তো কাকেও চিনি না।

ইন্‌স্‌পেক্‌টর বলিলেন,—বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করছি। বলিয়া তিনি ডাকিলেন,—দরোয়াজা...

একজন পাহারওয়ালা আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্‌পেক্‌টর বাবু তাকে একজন উকিল আনাইবার কথা বলিয়া দিলেন। সে চলিয়া গেলে ইন্‌স্‌পেক্‌টর বাবু কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছিল, ইনি কি করেছিলেন, সব বলুন দিকি আমায়।

কিরণ সব কথাই খুলিয়া বলিল, বলিয়া নিবেদন করিল যে-নারীর উপর উনি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি একজন ভদ্র মহিলা—তাঁর নামটা জানিতে না চাহিলেই সে কৃতার্থ হইবে। তাছাড়া তাঁকে যেন থানায় দাঁড়াইতে না হয় বা তাঁকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা না হয়—এই তার প্রার্থনা!

ইন্‌স্‌পেক্‌টর বাবু রজনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি এ-সব স্বীকার করেন?

রজনী বলিল,—সব সত্য।

ইন্‌স্‌পেক্‌টর বলিলেন,—আপনার সম্বন্ধে এ-সব কথা শুনে সত্যই বড় কষ্ট হচ্ছে! আপনারা বড় লোক—অবসরও আপনার প্রচুর। এই পয়সা আর অবসর কত ভালো কাজে খাটাতে পারেন। তা না হয়ে এমনি ইতর লোকের মত নোংরা কাজে হোলেন—ছি!

রজনী বলিল,—যথার্থই আমার অনুতাপ হচ্ছে, ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু। I beg a life's chance of you.

উকিল আসিয়া জামিন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে কিরণ একটা চিঠি লিখিয়া দিল, মামলা সে চালাইতে চায় না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—এই চিঠি কাল আমি দাখিল করব। আর রজনীবাবু, আপনি সরকারী গরিবখানায় কিছু দিয়ে দেবেন—তা হলেই মামলা তুলে নিতে কোন কষ্ট হবে না।

এদিককার ব্যাপার চুকিলে রজনী বলিল,—সেই যে মেয়েটি আজ মোটর চাপা পড়েছিল, তার বাপের নাম রঘুনাথ বাবু। তাঁদের ঠিকানা যদি দেন···আমাদের আপনার লোক তিনি...

ইন্‌স্‌পেক্টর সকৌতূহলে রজনীর পানে চাহিলেন, তারপর কাগজ-পত্র দেখিয়া তাদের ঠিকানা বলিয়া দিলেন,—বাগবাজার কালী-মন্দির; কৃপানাথ ঠাকুরের বাড়ী।

ঠিকানা জানিয়া লইয়া রজনী বাহিরে আসিল; আসিয়া কিরণকে বলিল,—তোমরা বাড়ী যাও—আমি তাঁদের নিয়ে এখনি তোমার ওখানে আসছি!

কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল,—মা-কালীর সে হাসি মিথ্যা নয়—আমাদের দুই বোনের প্রার্থনা তিনি শুনেচেন। রঘুনাথ বাবুকে এখনি দেখিতে পাবে...

এ কি সত্য, এ কি স্বপ্ন···না, এ পরিহাস! তার এত বড় দুরাশা তবে···লক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে পড়িয়া যাইতেছিল, কিরণ তাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—এসো, এবার স্বামীর সাজে তোমায় সাজিয়ে দি...

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

লক্ষ্মীর সমস্ত চেতনা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে জড় পদার্থের মতই নিজেকে কিরণের হাতে ছাড়িয়া দিল। কিরণ তার মুখ-হাত ধোয়াইয়া তাকে সাজাইতে বসিল—মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিয়া সিঁথিতে বেশ করিয়া সিঁদুর পরাইয়া, আলতায় পা দুখানি রাঙাইয়া, ভালো একখানি শাড়ী পরাইয়া লক্ষ্মীকে একটা কৌচে বসাইয়া দিয়া কিরণ মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মীর মনে হইতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! হোক স্বপ্ন—তবু এ বড় সুখের...তাই সে অমনি স্পন্দহীন স্তব্ধ বসিয়া রহিল—ঠিক যেন এক মাটীর পুতুল!

— ২০ —

লক্ষ্মীর স্পন্দিত বুকের উপর দিয়া সশব্দে কখন একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, এবং কখন যে রজনীর সঙ্গে তার প্রাণের চির-বাঞ্ছিতেরা আসিয়া ঘরে ঢুকিল—এগুলা সব যেন স্বপ্ন! হঠাৎ তার চেতনা হইল কপালে পটি-বাঁধা মন্টী যখন মা বলিয়া তার কাছে ছুটিয়া আসিল।

রঘুনাথ তীক্ষ্ণ স্বরে হাঁকিল,—মন্টী!

মন্টী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। রঘুনাথ তার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গেল! লক্ষ্মী চাহিয়া দেখে, রঘুনাথের চোখে তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! সে দৃষ্টির আগুন তার প্রাণটাকে নিমেষে পুড়াইয়া দিল।

লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পা এমন কাঁপিতে লাগিল যে আর

দাঁড়ানো যায় না। রঘুনাথ তার পানে তেমনি বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—তুমি তো বেশ আছ!...এই ঐশ্বর্য্য দেখাতে আমাদের ডাকিয়ে এনেছ! আমরা পথের ভিখারী, আর তুমি রাজ-রাণী! তা বেশ, তুমি সুখে থাকো! আমরা চললুম! রঘুনাথ লক্ষীকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সমস্ত পৃথিবী এমন ভয়ানক বেগে লক্ষীর পায়ের তলায় দুলিয়া উঠিল যে লক্ষী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। কিরণ তাকে ধরিয়া কৌচের উপর শোয়াইয়া দিল! তারপর সে রঘুনাথকে বলিল,—আপমি ভুল বুঝবেন না। আমি যেই হই—তবু শপথ করে বলতে পারি ভগবানের নাম নিয়ে যে লক্ষী সত্যই সতী-লক্ষী। ওর দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনলে পাষাণও ফেটে যায়! আপনার জন্যই ও প্রাণটুকু এখনো রেখেচে—আর আপনি এই সব কথা বলছেন! আপনি না স্বামী? ওর সঙ্গে ঘর করেছেন! ওর মনের কথা সবই তো আপনার জানা...সেই লক্ষীকে আপনি বুঝতে ভুল করেন...

রঘুনাথ এ কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হইয়া কিরণের পানে চাহিল। কিরণ রজনীকে দেখাইয়া বলিল,—এই তো ওর মস্ত সাক্ষী। উনিই বলুন...লক্ষী কি...

রজনীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মনকে প্রাণ-পণ বলে খাড়া করিয়া বলিল,—ইনি সতী-লক্ষী—আমার মা। আমি অন্ধ মোহে ওঁকে ঘর থেকে টেনে এনেছিলুম,—ভেবেছিলুম, নারীকে পাওয়া কোন কালেই শক্ত নয়! কিন্তু আমি শপথ করে বলছি, উনি নিষ্পাপ, সতী...

তারপর রজনী ধীরে ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিল। কেমন

করিয়া লক্ষ্মীকে প্রথম দেখিয়া তাকে পাইবার জন্ম সে পাগল হইয়া ওঠে, তারপর কি ফন্দী করিয়া সে তাকে ধরিয়া আনে, কি করিয়াই বা বন্দী করিয়া রাখে, তার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া তাকে পাইবার দুরাশা লইয়া মিনতি-ভরা ভিক্ষা চায়, জোর করে—কিন্তু লক্ষ্মী দুই পায়ে সে ঐশ্বর্য্য মাড়াইয়া ভাঙিয়া, সে বল তুচ্ছ করিয়া পলাইয়া যায়! তারপর আবার একদিন, আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাকে পুনরায় পাইবার জন্ম কি দুরন্ত আগ্রহে সে ছুটিয়া আসে—এবং তারি ফলে তার মনের উপর হইতে পাপের ভারী পাথরখানা হুড়হুড় করিয়া সরিয়া গিয়া মনকে মুক্তি দিয়া রজনীকেও আবার মানুষ হইবার মত সুযোগ দিয়াছে! থানায় রঘুনাথকে দেখিয়া সে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল! এ সতী-লক্ষ্মীকে কু-কথা বলিলে পৃথিবী এখনই ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

কিরণের চোখ দুইটা ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছিল! রজনীর কথা শেষ হইতে সে-ও খুলিয়া বলিল, দৈবাৎ সে লক্ষ্মীকে কেমন করিয়া পথে দেখে এক পিশাচের কবলে! ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই লক্ষ্মী রক্ষা পায়! নহিলে…

তারপর এখানে আসিয়া লক্ষ্মী সব আশা হারাইয়া মরিতে চাহিল! তারি কথায় দেশের বাড়ীতে লোক যায় লক্ষ্মীর চিঠি লইয়া এবং সে আসিয়া খপর দেয় সেখানকার বাড়ী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! তারপর লক্ষ্মী তাঁকে পাইবার জন্ম পাগলের মত আজ কালীঘাটে, কাল দক্ষিণেশ্বরে, নিত্য এই গঙ্গার তীরে ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—! সে ঘোরার এখনো বিরাম নাই!

সমস্ত কথাগুলি রঘুনাথের চিত্তকে একেবারে বিকল করিয়া দিল।

তার লক্ষ্মী তার জন্ত এত সহিয়াছে, আর তাকেই সে নিমেষের জন্তও এখন অবিশ্বাসের চোখে দেখিয়াছে! রঘুনাথের মনে হইল, এ চিন্তাই বা তাকে পাইয়া বসিল কি করিয়া!

কিরণ রঘুনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মণ্টীকে একেবারে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তারপর চুমায় চুমায় তার ছোট মুখখানি ভরিয়া দিয়া বলিল, —এসো মা এসো, মার কাছে এসো—

লক্ষ্মীর সর্ব্ব শরীর প্রচণ্ড আবেগে তখনো কাঁপিতেছিল! এ কি, সত্যই তার সামনে আজ তার চিরবাঞ্ছিত! এত-বড় আশাও তার এমন করিয়া পূর্ণ হইল! এখনো এ কি স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে, না...?

মণ্টী গিয়া মার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মীর দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। জলে-ভরা অস্পষ্ট দৃষ্টিতে মণ্টির পানে চাহিয়া সে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—মনে মনে ডাকিল, মণ্টি, মণ্টি, মা, মা—

তারপর সকলে চুপ—কাহারো মুখে কথা নাই! বুকের মধ্যে সকলেরই কিসের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল।

রজনী সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে একেবারে আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল, করিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল,—মা, আমায় ক্ষমা করুন। আমার সমস্ত অপমান ভুলে যান—

লক্ষ্মী যেন কেমন হইয়া গেল। সে যে কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—নারী যে কত বড়, তার মন যে হেলা-ফেলার বস্তু নয়, সে যে জলন্ত বহ্নি, তা আমি আগে বুঝিনি! তারপর কিরণের পানে চাহিয়া বলিল,—কিরণ, তুমিও আমায় ক্ষমা কর! যা ফেরাবার নয়, তা ফিরিবে না—কিন্ত

তোমরা দুজনে আশীর্ব্বাদ কর, জীবনের বাকী দিনগুলো যেন মানুষের মত কাটাতে পারি!

রঘুনাথ তখনো স্তব্ধ দাঁড়াইয়া। রজনী তার পানে চাহিয়া বলিল,—আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, সে সাহসও নেই! তবে যদি কোনদিন পারেন, আমায় ক্ষমা করবেন...মন যা চায় তাই তাকে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়া—মানুষের পক্ষে এ ভাব ঠিক নয়। সে তৃপ্তি কত ক্ষণিক, আমি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেচি! সে তৃপ্তি এত ক্ষণিক বলেই একটার পর আর-একটার দিকে ক্রমেই অসহ্য ঝোঁক নিয়ে অন্ধ হয়েই আমি ছুটেছিলুম!...আপনি কত মহৎ, এখনো আমায় গুলি করে মারচেন না, এতেই আমি বুঝচি...তবে এবার আমায় শোধরাবার সুযোগ দিন...বলিতে বলিতে সে রঘুনাথের দুই পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—বলুন, কোনদিন আমায় ক্ষমা করতে পারবেন...? একটু আশা দিন, নাহলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে না!

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল; আর এই একটা নিশ্বাসের সঙ্গে এতদিনকার পুঞ্জিত বেদনা,আর হাহাকার যেন তার বুক ছাড়িয়া বাহির হইয়া বুকটাকে হালকা করিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে ক্ষমা করা শক্ত নয় তো! যা কেড়ে ছিলেন, তা আবার ঐ হাতেই আমায় ফিরিয়ে দিলেন...তেমনি অমলিন, তেম্‌নি শুভ্র!

কিরণ মন্টার মাথায় হাত দিয়া বলিল,—এ যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে মা...

রঘুনাথ বলিল,—ওকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের! আর ভাগ্যে ওর এই বিপদ হয়েছিল, নাহলে এ যে আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেতো!

কিরণ বলিল,—রজনীবাবুর মুখে শুনলুম! আজকের বিপদগুলো

এমন সম্পদ বুকে করেও এসেছিল,…আশ্চর্য্য !…তা আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাই…একটু কিছু মুখে দিক্ ! আহা, মুখখানি শুকিয়ে উঠেছে একেবারে …এসো তো মা…বলিয়া কিরণ মঞ্চীকে লইয়া চলিয়া গেল।

রজনী বলিল,—আজ আপনারা কথাবার্ত্তা কন্, কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো এসে। আমার মা পেয়েছি…জীবনে মাকে কোনদিন জানিওনি, তাই এত কষ্ট। তাই এমন একটা জ্বালার মত চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম, মানুষ হইনি !…আজ আশা হয়েছে, যার পয়ের তলায় পড়ে এবার বুঝি মানুষ হবো !

রঘুনাথ ও লক্ষ্মীকে আর একবার প্রণাম করিয়া রজনী বিদায় লইল।

সে চলিয়া গেলে রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুইজনে কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—লক্ষ্মী মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া, আর রঘুনাথ দুই চোখে ক্ষুধিত তৃষিত দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া !

বহুক্ষণ এমনি থাকিবার পর রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া লক্ষ্মীর হাত দুখানি নিজের হাতে তুলিয়া ধরিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল। তার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটিল।

রঘুনাথ বলিল,—এত কষ্ট সয়েছ তুমি লক্ষ্মী…আমি স্বামী, আমি তোমায় রক্ষা করতে পারিনি, তোমার সম্মান রক্ষার জন্ম কোন আয়োজনও করি নি…

লক্ষ্মী রঘুনাথের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা কর। তোমাদের দেখছি, আর আমার কোন সাধ নেই। আমি এবার মরতে চাই—দয়া করে আমায় সে অনুমতি দাও…

রঘুনাথ বলিল,—এ কথার মানে কি, লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী আবেগের সহিত বলিল,—না, না, আমি এ কথা অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেছি...তোমার ঘরে আমার আর ঠাঁই নেই! সব শান্তি নষ্ট করবে তুমি আমার জন্তে···? না, তা হবে না! পাড়ার লোক পাঁচ কথা বলবে, তা সহ্ করে···না···না...

রঘুনাথ বলিল,—সে সব কথা আমি গ্রাহ্যও করিনে। তারা কি আমার মত তোমায় জানে ?

লক্ষ্মী বলিল,—তবু সে সমাজ—

রঘুনাথ বলিল,—এটা সত্য যুগ নয়, ত্রেতাও নয় যে সমাজের জন্ত আমি মানুষ হয়ে আমার নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীকে ত্যাগ করবো! মানুষের মন যে না ছাখে, সমাজের সে কেউ নয়, কেউ হতেও পারে না কোনদিন···আগে মানুষ, তারপর সমাজ!

লক্ষ্মী বলিল,—কিন্তু আমার উপর এত বিশ্বাস···

রঘুনাথ তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল,—তোমায় অবিশ্বাস করলে আমার নিজের উপরও যে সব বিশ্বাস হারাবো, লক্ষ্মী! তোমার মন—? এতদিনেও কি তার কোনোখানটা আমার জানতে বাকী আছে? তুমি কি শুধুই আমার ঘরের ঘরণী? তুমি যে আমার প্রাণের প্রেয়সী···

তারপর রঘুনাথ বলিল,—সেদিন নদীর ধারে এসে যখন দেখলুম, ওপারের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে, বুকের মধ্যটা এমন দুলে উঠলো...তবু এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত বড় বিপদ আমারি কপালে ঘটেছে!···বলিতে বলিতে তার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল; চোখের সামনে অমনি ফুটিয়া উঠিল, বায়োস্কোপের পটে চলন্ত ছবির

মতই সেই আগুনে-রাঙা আকাশ, লোক-জনের চীৎকার...তারপর... শূন্য ঘর! পাড়ার লোক আসিয়া কতজনে কত কথাই বলিয়া গেল! অসহ্য সে সব কথার হাত এড়াইতে মন্টীকে লইয়া রঘুনাথ দেশ ত্যাগ করিল।...পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে,...শেষে এক পূজারী ব্রাহ্মণ, মেয়ের শোকে কাতর হইয়া পড়িয়া ছিল, সে-ই বুক পাতিয়া দুইজনকে ঠাঁই দিয়াছে! আর যতীশ, যতীশের মা...তাঁদের কথা সোনার অক্ষরে বুকে লেখা থাকিবে, চিরদিন!"

রঘুনাথ আজই ভাবিয়াছিল, এই মোটরের ধাক্কা খাওয়ার ফলে যদি মন্টীর বেশী অসুখ হয়,...তাহা হইলে এ কুঁড়ে-ঘরে কে দেখিবে! তাছাড়া যতীশ বলিয়া গিয়াছে, কাল সকালেই সে আসিয়া তাঁদের লইয়া যাইবে, কোন কথা শুনিবে না। মন্টী যে চোট পাইয়াছে,— এখানে কে তাকে দেখিবে!

রঘুনাথ সব কথাই খুলিয়া বলিল। লক্ষ্মী বিভোর মন লইয়া শুনিতেছিল। এ যেন কার রচা দুঃখের কাহিনী সে শুনিতেছে...এ লোকগুলি যে তারই প্রাণের জন, এ কথাও সে ভুলিয়া যাইতেছিল।

গাঢ় সমবেদনায় লক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া কেবলি জল ঝরিতেছিল।

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—মন্টীর কথা আজই যতীশের মা বলছিলেন যে, ওকে আমার হাতে দাও, ওটিকে আমি নেবই, আমার যতীশের জন্য!...

লক্ষ্মীর বুক দারুণ উত্তেজনায় দুলিতে লাগিল। সে বিমূঢ়ের মত দুই চোখে জলের ধারা ছুলাইয়া বসিয়া রহিল।

রঘুনাথ লক্ষ্মীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল।—এই তার প্রাণের প্রেয়সী, কতদূরে গিয়াছিল, কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে...! আজ

আবার তার চোখের সামনে, তার বাহুর বাঁধনে সে ফিরিয়া আসিয়াছে!...

রঘুনাথ লক্ষ্মীর মুখখানি টানিয়া মুখের কাছে আনিল—যেমনি চুম্বন করিতে যাইবে, অমনি দ্বারের পাশে কিরণের স্বর শুনা গেল। কিরণ আসিয়া বলিল,—কিন্তু একটি কথা...মেয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে, বুঝলেন রঘুনাথ বাবু, এ ঘর-দোর আমার এই মেয়েটির অভাবেই এতদিন অপূর্ণ ছিল, আজ সে এসে একে পূর্ণ করেছে। ঘর আমার আলো হয়ে উঠেছে...তার উপর আপনাদের হাসির আলো... ঘর আজ আমার আলোয় আলো! এ আলোর মুখ যে কখনো দেখিনি আমি...

বলিতে বলিতে কিরণের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল; সে স্বরে মিনতি ভরিয়া সে আবার বলিল,—এ আলো নিবিয়ে দিয়ে আমার এ-ঘর আর আঁধার করে চলে যাবেন না...

রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুইজনেই বিস্মিত চোখে ফিরিয়া দেখিল, সামনেই মণ্টী—তার মুখ পুলকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, আর কিরণ...তার দুই চোখের কোলে জল একেবারে ঘনাইয়া আসিয়াছে!

রঘুনাথ তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আপনার কথা আমাদের কাছে দেবীর আদেশ! তার যদি অপমান করি, তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাবে!

শেষ

PRINTED BY KAMALA KANTA DALAL
AT THE KANTIK PRESS,
22, SUKEA STREET, CALCUTTA.

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

আঁধি	...	২॥০	বাবলা	...	১॥০
কাজরী	২য় সংস্করণ	১॥০	মাতৃঋণ	..	১॥০
দরদী	২য় সংস্করণ	১৲	স্ত্রীবুদ্ধি	...	১৸০
সোনার কাঠি	২য় সংস্করণ	১৲	পথের পথিক	...	।৵০
নবাব	...	২॥০	নেপথ্যে	...	॥০
বন্দী	২য় সংস্করণ	১৲	পিয়ারী	...	যন্ত্রস্থ
ছোট পাতা	...	১॥০	নিরুদ্দেশের যাত্রী	...	১॥০
মুক্ত পাখী	...	২৲	লাল ফুল	...	যন্ত্রস্থ

ছোট গল্প

শেফালি	২য় সংস্করণ	৸০	নির্ঝর	২য় সংস্করণ	১৲
পরদেশী	২য় সংস্করণ	১৲	মণিদীপ	...	১৲
পুষ্পক	...	১৲	বৈকালি	...	॥০
পিয়াসী	...	১।০	মৃণাল	...	১।০
তরুণী	...	১।০			

ছেলেমেয়েদের বই

সাঁঝের বাতি	...	॥০	ফুলের পাখা	...	॥০
তারার মালা	...	॥০	চাঁদের আলো	...	॥০

নাট্যগ্রন্থ

যৎকিঞ্চিৎ	...	ষ্টারে অভিনীত	...	॥০
দশচক্র	...	ষ্টারে অভিনীত	...	।৵০
গ্রহের ফের	...	কোহিনূরে অভিনীত	...	।০
দরিয়া	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	॥০
রুবেলা	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	॥০
শেষ বেশ	...	ষ্টারে অভিনীত	...	৸০
হাতের পাঁচ	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	৸০
পঞ্চশর	...	ষ্টারে অভিনীত	...	।৵০